

সমরেশ মজুমদার

আমাকে চাই



প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ ৥ মাঘ ১৪০১

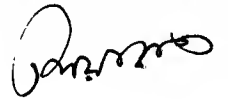
প্রচ্ছদ
ঋণ এম

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা ১১০০ থেকে
মোঃ আলতায়ফ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালামানি মুহ্র
সংখ্যা ৩৫/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৬০.০০ টাকা

আমাকে চাই উপন্যাসটি প্রথম বেরিয়েছিল আনন্দবাজার
পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মোহর মফস্বল
শহরের মেয়ে, মেয়ে হলেও অন্য আর দশটি মেয়ের থেকে আলাদা।
ছেটবেলা থেকেই সে শার্ট-প্যান্ট পরে আসছে। শুধু শার্ট-প্যান্ট নয়,
তার সব কিছুতেই ছেলেদের স্বভাব স্পষ্ট। মোহর ভাবে ছেলেরা যা
পারে মেয়েরা কেন তা পারবে না? ছেলেরা ফুটবল খেলে, ক্রিকেট
খেলে। সুতরাং মেয়েরাও খেলবে। এই করে সে ফুটবলের একজন
ডাল গোলকিপার হয়ে গেল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধা
পাওয়ায় একসময় ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়ে জুডো শিখেছে। জুডো
প্রতিযোগিতায় দু'দু' রাউন্ড জিতে পরে হেরে গিয়েছে মেয়েদের
প্রকৃতিগত অসুবিধার জন্য। এখানেই সে কিছুটা উপলব্ধি করতে
পেরেছে মেয়েদের দুর্বলতা কোথায়। জুডো ছেড়ে কলেজে বন্ধুদের
আজ্ঞায় মিলেমিশে তার লেখালেখির ওপর ঝোঁক চলে আসে। তার
লেখার বিষয়বস্তু হয় মেয়েদের সমস্যা। লেখার জনপ্রিয়তা বাড়তে
বাড়তে এক সময় শহর থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময়
তার ব্যক্তি হয় পৃথিবীজোড়া।

উপন্যাসটি আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে অনেকে মনে প্রশ্ন
জাগেছে মেয়েটি কে? অনেকেই মনে করেন মোহর আর কেউ নয়,
আমাদের বাংলাদেশের মেয়ে তসলিমা নাসরিন। কথাটা কতটুকু সত্য
তা আমরা বলতে পারছি না। এই উপন্যাস পড়লে পাঠকরাই এর
জবাব বুঝে পাবেন।



হলুদপুরের নাম কোনও মানচিত্রে নেই। জেলার অন্য অনেক জায়গার নাম মুখে মুখে ঘোরে কিন্তু হলুদপুরের কথা বড় একটা শোনা যায় না। কোনও কলকারখানা নেই, ব্যবসাপাতি বলতে কয়েকটা দোকান, অথচ জায়গাটা নাকি বর্ষিষ্ণু। বেশ বড়সড় কিছু বাড়ি অনেককাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি আর বাগান এবং ছিমছাম রাস্তাঘাট। বাতাসে ধোঁয়া নেই, কর্কশ আগুয়াজ্জ বাজে না। এমনকি পূজাপার্বণে মাইকও।

হলুদপুরের মেয়েরা বড় সুন্দরী, তাদের ভাল ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। ওই একটা ব্যাপারে অবশ্য অনেকেই খোঁজ খবর নেয়। ইদনিং বিবাহযোগ্য মেয়ে বলতে আর কেউ নেই। যে আছে তার বয়স মাত্র বারো এবং তাকে দেখলে মেয়ে বলে ভাবাই কঠিন।

হলুদপুরের অন্নদা মুখার্জি শান্তশিষ্ট মানুষ। স্কুলে পড়ান। স্ত্রী পর পর দুটি মৃত সন্তান প্রসব করায় এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী ঢুল ঢুল চোখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি চাস?'

'বাবা, আমার বংশ রক্ষা করে দাও। সন্তান পৃথিবীতে আসছে মৃত হয়ে।'

'ঠিক আছে। হবে। জেলে হবে তোরা। আর মেয়ে যদি হয় জেলে সাজিয়ে রাখবি।'

অন্নদা মুখার্জির স্ত্রী বৎসরান্তে কন্যা সন্তান প্রসব করলেন এবং তার শরীরে প্রাণ ছিল। যে মহিলা ধাই-এর কাজ করেছেন তিনি পাঁচজনকে বলে বেড়ান, 'একি মেয়ের বাবা, শতচেষ্টা করেও কীভাবে পারিনি একফোঁটাও।' মেয়েটি বেঁচে গেল। সেই বাঁচা এমন বাঁচা যে হলুদপুরের মানুষজন ভু কৌচকায়।

মেয়ের নাম রাখার সময় অন্নদা মুখার্জির সমস্যা হয়েছিল। সন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুযায়ী কোনও মেয়েলি পোশাক কেনা হয়নি। তবে দুধপোষা শিশুদের তো একই পোশাক থাকে। সাতমাসে ভাতের সময় ফ্রকের বদলে শার্ট এল। ইজেরের বদলে প্যান্ট। একেবারে মেয়েলি নাম না রেখে অন্নদা মুখার্জি রাজশেখর বসুর চলচ্চিত্রকা থেঁটে নাম রাখলেন মোহর। তাঁর মনে হল এতে চট করে বোঝা যাবে না নারী না পুরুষ।

বারো বছরের মোহরের চালাচলনে নারীত্ব বলতে বাঙালি যা বোঝে তার বিন্দুমাত্র নেই। সে আর পাঁচটা ছেলে যা করে তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয়। তারা মেসব শলাকলি ব্যবহার করে তাত তায় সন্ধ্যাচ হয় না। এমনকি স্কুলের মাঠে গোলকিপার হয়ে তার খেলা দেখতে ভিড় জমে যায়। হলুদপুরের একমাত্র স্কুলটিতে ছেলেমেয়ে একসঙ্গেই পড়ে কিন্তু মেয়েরা তাদের জগৎ আলো করে নেয় প্রতিটি বছর। মোহর ছেলেদের সঙ্গেই মেশে। তার পরনে হাফ প্যান্ট এবং শার্ট, মাথার ঢুল ছেলেদের মত টুটা। এ বছর স্কুলের জুনিয়ার ফুটবল দলে সে গোলে খেলেছে ছেলেদের সঙ্গে। তার তরুণরতায় হলুদপুর একটাও গোল না খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

মানুষের কান এবং চোখ অভ্যাসে সব মেনে নেয়। মোহরকেও মেনে নিয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন দলীয় কোনও খেলোয়াড় ভুল করলে গোলপোস্টের নীচে দাঁড়ানো মোহর যখন গালাগাল দেয় তখন সেটাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় দর্শকদের। মোহরের হিচ্ছে সে জেলার

জুনিয়র টিমে খেলবে। গোলকিপার হিসেবে এখন তার রেকর্ডই সেরা। কিন্তু গেমস, টিচার শান্তিবাঘা মাথা নাড়েন, 'তা হয় না। আমরা স্কুল টিমেই তোকে বেলাস্টি বানিকটা বেআইনি করে। জেলা টিমে নেওয়া যায় না।'

'কেন না?'

'আফটার অল তুই মেয়ে। টুর্নামেন্টটা ছেলেদের টুর্নামেন্ট। অন্য টিম আপত্তি করবেই।'

'আমি মেয়ে তো কি হল? কোনও ছেলের চেয়ে কি কমতি আছি?'

'আ্যাঁ। তুই আমার সামনে ওসব শব্দ বলবি না।'

'কি সব শব্দ?'

'কমতি আবার কি? কম বলতে অসুবিধে হয়?'

'স্যার, আপনি না—!' খুব হাসল মোহর, 'কম অর কমতির তো একই মানে। যাকগে, আমার বয়সী যে—কোনও ছেলে যা পারে আমি তার চেয়ে ঢের বেশি পারি। তাহলে আমাকে নেবে না কেন?'

এখন হয়তো পারিস, পরে পারবি না।'

'পরেকার কথা পরে দেখা যাবে।'

হলুদপুর থেকে সেবার তিনজনকে জেলা-দলে নির্বাচিত করা হল এবং অবশ্যই মোহরের নাম সেই। মোহরের জাতাবার ছেলের অভাব হল না। সে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করল। তিনি দশমা খুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি।

সামনের বছর থেকে মেয়েরা যা খেলে, এই ধরো ব্যাডমিন্টন, তাই খেলো। ফুটবল খেলো না।'

'কেন?'

'ওটা মেয়েদের খেলা নয়।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'ওই খেলায় গায়ের জোর দরকার হয়। ধাক্কাধাক্কি চলে। তুমি বড় হচ্ছ, এটা ঠিক নয়।'

'আমারও গায়ে জোর আছে। কেউ আমাকে ফাঁটল করলে আমি হজম হবো না। আর এর সঙ্গে বড় হবার কোনও সম্পর্ক নেই।' মুখের ওপর জবাব দিল মোহর।

এতএব হেডমাস্টারমশাই অমদা মবার্জিকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এই স্কুলেরই শিক্ষক। মোহরের সামনে খুব ভদ্রভাবে তাঁকে সমস্যার কথা বলে বললেন, 'মেয়েকে বোঝান।'

মোহর বলল, 'বাবা, উনি বলছেন, ফুটবল মেয়েদের খেলা নয়। কিন্তু কলকাতায় মেয়েরা ফুটবল খেলে, ইন্টার স্টেট প্রতিযোগিতা হয়। আর আমার দলের কারও চেয়ে আমি খারাপ বোলি? এবার অন্তত এগারোটা সিগুর গোল আমি ঘটিয়েছি একধা শান্তি স্যারই বলছেন।'

অমদা মবার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন। বারো বছরেই মেয়ে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চিতে পৌঁছে গেছে। যদিও মেয়েদের শারীরিক চিহ্নগুলো ওর শরীরে তেমন প্রকট নয় কিন্তু স্ত্রীর কাছে ছেনেছেন মোহরের নারীত্ব এসে গিয়েছে। তিনি এতকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সন্ন্যাসীর কথা মনে রেখে স্ত্রীর আপত্তি শোনেননি। কিন্তু এখন বোধহয় তাঁর মত পাট্টোনে উচিত। অমদা মবার্জি বললেন, 'মোহর, আইনে যদি না থাকে তাহলে আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ নেই।

সেটাকে মেনে নেওয়া ভাল।'

'আইন কোথায় লেখা আছে? আমি দেখতে চাই।' গৌজ হয়ে বলল মোহর।

অমদা মবার্জি উম্ম হাসল, 'এভাবে কথা বোলো না। তোমার বয়সে এটা মানাচ্ছে না।'

হেডমাস্টার মশাই হাসলেন, 'শোন মোহর। আমরা তোমাকে সন্দেহ করি বলে অনেক কিছু মেনে নিই। এই যেমন ধরো তোমার ইউনিফর্ম। তুমি স্কুলে যেয়ে পোশাক পরো না খুব তো

কখনও কিছু বলিনি। কিন্তু বাইরের লোক সেকথা শুনে কেন? আইনের কথা বললে, ওটা আমিও শুনেছি, পড়িনি। তোমার মনে যদি সন্দেহ থাকে তো কাল রবিবার, বাবাকে নিয়ে শহরে চলে যাক। বিখ্যাত ব্যবসারী হরেন বাঘ মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করো। তিনি জেলা ফুটবলের সভাপতি। সব কিছু জানেন। তিনি যদি রাক্তি হন তাহলে ওর ওপর কথা নেই।'

স্ত্রী তীব্র আপত্তি করলেন। পড়াশুনা শিকয়ে তুলে মেয়ে যাচ্ছে ফুটবল খেলায় তব্বির করতে আর বাবা তাতে ইচ্ছা জোগাচ্ছেন। কিন্তু অমদা মবার্জির মনে হল জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চেষ্টে মোহর নিজেই জানুক কোথায় থামতে হয়। ওর জীবনযাপনের পদ্ধতি ওই নিজে শেখা থেকেই পরিবর্তিত হতে পারে। তাই স্ত্রীর কথা কানে না নিয়ে তিনি পরের দিন শহরের বাস ধরলেন।

বারো বছরের জীবনে মোহর শহরে এসেছে কয়েকবার। পুজোর আগে কেনাকাটা করতেই বেশির ভাগ সময় আসতে হয়েছে। আর একবার কলকাতার বড় টিমের খেলা দেখতে। মাহেরে আপত্তি সত্ত্বেও আঙ্গ সে জিনিসের প্যাট আর সার্ট পরে এসেছে। এই প্যাটটার ওপর ওর বেশ ময়া আছে। অমদা মবার্জির এক মাসতুতো ভাই বিদেশ থেকে সম্প্রতি পাঠিয়েছিলেন মোহরের জন্য। কার্টিংটাই আলাদা।

হরেন মাহের বাড়িটি বিশাল। রবিবার বলেই তাঁর বৈঠকখানার ঘরে ভিড় বেশি। জেলার খেলাধুলা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করতে এসেছেন। ঘরের এক কোণে বাবার পোশে দাঁড়িয়ে বৃত্তকে দেখল সে। ফর্সা, গোলগাল, মাথায় টাক। চোবের তলায় কমলালেবুর কোয়ার মত মাংস ঝুলছে। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ কেবলই মোহরের দিকে চলে আসছিল। মনে মনে মোহর সালা বাঘের ছবি ভাবল। তারপরেই শুয়োরের কথা মনে এল। চর্বিওয়ালা সাদা শুয়োর।

টেবিলের উল্টো দিকে শরীর হেলিয়ে বসে হরেন রায় গলা তুললেন, 'এদিকে, হ্যা, এগিয়ে এসো। কি চাই তোমার?'

অমদা মবার্জি শশব্যস্তে মেয়েকে নিয়ে এগোলেন। ভিড়টা একটু আলাগা হলে সামনে পৌঁছে তিনি নমস্কার করলেন, 'আজ্ঞে, আমি একজন শিক্ষক। নাম অমদা মবার্জি। হলুদপুরে থাকি।'

'হলুদপুর? ও হ্যাঁ। ওখানে ফুটবল খেলা হয়, তাই চোপ।'

'আজ্ঞে ছেলো খেলো। তিনজন জেলার জুনিয়র দলে চোপ পেয়েছে?'

'ব্যাং। তাদের মন দিয়ে খেলতে বলুন। ভাল খেলতে থাকলে আমার টিমে নিয়ে নেব।' চোখ বন্ধ করলেন হরেনবাবু, 'এটি কে?'

'আজ্ঞে আমার মেয়ে। প্রণাম করো।' অমদা মবার্জি ইশারায় করলেন।

মোটের ইচ্ছে ছিল না। মোহর কি করবে বুঝতে না পেরে শুধু এক পা এগোল। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে হরেন রায় খপ করে তার হাত ধরে বলে উঠলেন, 'খাক, খাক। প্রণাম কেন? তুমি মেয়ে? আঁ? দেখে তো মেয়ে বলে মনেই হয় না। কি বলেন আপনারা?'

সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনসূচক গুঞ্জন উঠল। হরেন রায় আবার চোখ ঝুললেন, 'আজকাল অবশ্য ছেলোমেয়ের তফাত খুব একটা নেই। মার্টিনাকে দেখে কেউ মেয়ে বলে ভাববে? কি সার্ড। তুমি কি করো?'

'ফুটবল খেলি।'

'আঁ? ফুটবল? কার সঙ্গে? হাতটা ধরেই ছিলেন হরেনবাবু। মোহর হাতের চেটোয় ওর আঙুলের চাপ অনুভব করছিল। বিচ্ছিরি রকমের অনুভূতি।

অমদাবাবু জবাব দিলেন, 'ওহ ও আমাদের স্কুল টিমের গোলকিপার। ছেলেদের সঙ্গে খেলো।'

পাশে বসা এক শ্রৌচ বলে উঠলেন, আচ্ছা। তুমিই মোহর? খুব ভাল খেলা বলে শুনেছি।
‘তাই নাকি?’ হরেন রায় উদ্ভাসিত, ‘ভাল খেলে? স্কুল টিমে খেলে? মেয়ে হয়?’
শ্রৌচ বললেন, ‘ওর কথা আমরাও শুনেছি। ওর জনেই হলদুপুর এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে
একটাও গোল না খেয়ে। শান্তি ওদের গেমটিচার। তাই তো?’

‘হ্যাঁ। অম্লদাবাবু মেয়ের প্রশংসায় খুশি হচ্ছিলেন।
হরেন রায় মোহরকে আরও একটু কাছে টেনে কোমরে হাত রাখলেন, ‘এ যে দেখছি দাবুণ
মেয়ে। তা আমার কাছে কি উদ্দেশ্যে আগমন?’

মোহরের অধস্তি হচ্ছিল কোমরে। সেটাকে উপেক্ষা করে সে বলল, ‘এমন কোনও আইনর
আছে যে ছেলের টিম মেয়েরা খেলতে পারবে না?’
‘তুমি-তো স্কুল টিমের খেলোয়াড়। তোমার আইনে কি দরকার?’

‘আমি জেলা টিমে খেলতে চাই। আমরা চেয়ে ভাল কোনও জুনিয়র গোলকিপার নেই।’
হরেনবাবু এবার শ্রৌচের দিকে তাকালেন। শ্রৌচ বললেন, ‘কিন্তু মা, আমাদের তো মেয়েদের
ফুটবল চালু হয়নি। কলকাতায় হয়েছে। আর ডিফেন্ড জুনিয়র টিম অবশ্যই বয়েজ টিম। সেখানে
তো মেয়েদের নেওয়া যায় না।’

‘কোন আইন আছে?’
‘নামই তো বলে দিচ্ছে বয়েজ টিম।’
‘আমার বয়সী কোনও ছেলে দশটা পেনাল্টি মারলে অস্বস্ত চারটে আমি বিচাৰ। অন্য কোনও
ছেলে গোলকিপার দাঁড়াক আমি গুনে গুনে দশটাও আটটা গোল দেব। তাহলে আমি ছেলেরদের
থেকে কম হলাম কিসে?’ মোহরের গলায় জেদ স্পষ্ট।

হরেনবাবু মাথা নড়ালেন, ‘না। তুমি কম নও। তবে আমি নিয়ম ভাঙতে পারি না।’
‘নিয়মটা করেছে কে?’
‘তা তো জানি না।’

‘আগে স্বামী মরলে বউকে পুড়িয়ে মারার নিয়ম ছিল। এখন কি মানা হয়?’
‘হুম। আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে দেখি। তার চেয়ে তুমি যদি কলকাতায় গিয়ে
মেয়েদের লিগ খেলতে চাও আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কি, মেয়েকে পাঠাবেন?’
হরেনবাবু অম্লদা মুখাঙ্কিকে প্রশ্নটা করলেন। অম্লদা মুখাঙ্কি মুশকিলে পড়লেন। কোনও মতে
বলতে পারলেন, ‘একটু ভেবে দেখি। বাড়িতেও কথা বলা দরকার।’

‘ভাবু। ভেবে জানাবেন। আপনার মেয়ের ওপর আমার নজর রইল।’ হরেন রায় হাত
সরালেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে মোহর বলল, ‘ধৃত, আমি আর ফুটবল খেলব না।’
অম্লদা মুখাঙ্কি মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছিল। একটু সান্ত্বনা দেবার
ভঙ্গিতেই তিনি বললেন, ‘আমার মনে হয় তোমার মাকে রাজি করানো যাবে।’

‘কেন?’
‘ওই যে, উনি বললেন কলকাতায় পাঠাতে।’
‘না। আমি কলকাতার মেয়েদের দলে খেলব না। তোমাকে কাউকেই রাজি করাতে হবে না।’

অম্লদা মুখাঙ্কি এবং তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন মেয়ে একটা বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে এবং তার ফলে ওর
জীবনে বড় রকমের পরিবর্তন আসবে। হয়তো ছেলেমি ব্যাপারটা কটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটল না। খেলার মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিল মোহর কিন্তু ছেলেরদের সঙ্গে
আড্ডা মারা ছাড়ল না। পোশাক এবং আচরণও এক রইল। শুধু এবার থেকে ঘন ঘন লাইব্রেরি
থেকে বই আনতে দেখা গেল। এই ব্যাপারটা অম্লদা মুখাঙ্কিকে খুশি করল।

হলদুপুরে এখন বিবাহযোগ্য যুবতী নেই কিন্তু কিশোরী বা বালিকার সংখ্যা কম নয়। এরা
সবাই মোহরের দিকে অন্যতরে তাকায়। সেই চোখটা তৈরি হয়েছে বাড়িতে মায়েরদর কথা শুনে
শুনে। বারো বছরের মেয়েকে ছেলে শাঙ্কিয়ে রাখা তাদের মায়েরা পছন্দ করে না এবং তাই নিয়ে
প্রায়ই আলোচনা করেন। সেই আলোচনা শেষ হয় একটা আশঙ্কায়, যে কোনও দিন দুর্ঘটনা
ঘটতে পারে। বলার ধরনে মনে হয় সেরকম কিছু ঘটলে তাঁরা দুঃখিত হবেন না। নিজের
কিশোরীকে তাঁরা সবসময় সতর্ক করে দেন সমবয়সী বা উচ্চ ক্লাশের ছেলেরদের থেকে দূরে
থাকতে। তারা কথা বলতে এলে যেন এড়িয়ে চলে এমন নির্দেশ থাকে। মেয়েরাও বুঝে গিয়েছে
প্রতিটি ছেলের মনে কুমতলব পুষে রাখা এবং মেয়েদের ঠকিয়ে দেবার জন্যে ঘুরঘুর করে। এই
ঠকিয়ে দেবার ধরনটা কারও কারও অস্পষ্ট, কারও কাছে চূড়ান্ত। ফলে কৌতূহল থাকলেও ভয়
তাদের সামনে পাঁচিল হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে খেলা ছেড়ে দেওয়া মোহর তাদের কাছে অন্য
ভূমিকা নিয়ে নিল। মোহরের মধ্যে সরকম ছেলেরি আছে। প্যান্ট সার্ট থেকে চুল, ইটচালা থেকে
কথা বলা এমনকি ছেলেরদের মত শালা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারকরায় মোহর এত স্বচ্ছন্দ যে তাকে
ছেলে বলে ভাবতে কোনও অসুবিধে হয় না মেয়েদের। এবং সে যখন শারীরিক দিক থেকে ছেলের
নয় তাই তাদের ঠকিয়ে কিছুই নিয়ে দিতে পারার ক্ষমতা ওর নেই। অতএব এমন একজনের
সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অভিজ্ঞা কারও কারও মনে তীব্র হয়। যেহেতু আর পাঁচটা ছেলের মত
মোহরের কোনও মেয়ে বন্ধু নেই তাই ওদের মধ্যে কমেও কয়েকটি সাহায্যী। স্কুল ছুটির পর একটি
মিষ্টি তৈয়ারী কিশোরী হঠাৎই তার সামনে এগিয়ে এসে বলল, ‘তুমি যদি কাউকে না বলা
তাহলে তোমাকে একটা জিনিস দিতে পারি।’

‘কি জিনিস?’ মেয়েটার নাম রঞ্জনা, মোহর তেনে এবং জানে এরা তাকে পছন্দ করে না।
‘আগে বলা কাউকে বলবে না।’ মেয়েটা হাসছিল আর চারপাশে তাকাচ্ছিল। ওর মুখ লাল।
‘বেশ। বলব না।’ মোহর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

‘হারা।’ চট করে একটা ভাঁজ করা কাগজ মোহরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটা দ্রুত উধাও
হয়ে গেল। মোহর খুব অবাক হল। এইসময় ওর দুই ছেলবন্ধু এগিয়ে আসছিল। তাদের
একজন হেসে বলল, ‘তোকে কি দিয়ে পালাল রে?’

‘তাকে তোর কি?’ মোহর কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।
‘এমন ডাবে লেলে যেন প্রেমপত্র লিখে।’
দ্বিতীয়জন বলল, ‘তুই একটা ভিডিয়ে। মোহরকে কেন প্রেমপত্র দেবে?’

মোহর চোখ ছোট করল, ‘কেন? আমাকে দিতে দোষ কি?’
দ্বিতীয়জন হাসল, ‘দুঃ। মেয়েতে মেয়েতে প্রেম হয় নাকি?’
মোহর মনোতে চাইল না। মনে নিলে সে হেরে যাবে, ‘হয় না?’

‘কক্ষনা না। যে কোনও সিনেমায় দেখবি একজন হিরো আর হিরোইন থাকে। মিঠুন চক্রবর্তী
ওরা। হিরো নেই, দুজন মেয়ে সিনেমার নায়ক নায়িকা হয় নাকি?’

মোহর একটু নিশ্চয় হল। কথাটা সত্যি। সিনেমার পোস্টারে হোমালিনী আর রেখার নাম
জিতেন্দ্র আর হোমালিনীর বদলে সে কোনও দিন দেখেনি। এইসময় প্রথম ছেলেটা খ্যাক খ্যাক
করে হেসে উঠল। মোহর রেগে গেল, ‘তুই হাসছিল কেন?’

‘ক্লাশ টেনের সুভাষা সেদিন আমাকে বলছিল বিশেষ ছেলেরদের সঙ্গে ছেলেরদের প্রেম হয়
আবার মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের। সেই প্রেমে বলাচলকা হয় না। তোরও তাই নাকি?’ ছেলেটি
কথা শেষ করা মাত্র হাত চালাল মোহর। ছেলেটির চোয়ালে লাগামার সে গালে হাত দিয়ে বসে
পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছেলেটি তার ওপর ব্যাপিয়ে পড়ল, ‘এই মারলি কেন?’ ততক্ষণে প্রথম
ছেলেটি পা চালিয়েছে। প্রত্যন্ত একটা আঘাত লাগল মোহরের কোমরে। এইসময় অন্যছেলেরা ছুটে

আসায় মারামারি খামল। উঠে দাঁড়াতে পারছিল না মোহর। একটা চড়ের বিনিময়ে সে যত আঘাত পেয়েছে তা সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছিল। ভিড় ওদের নিয়ে গেল হেডমাষ্টারের ঘরে। তিনিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসছিলেন। মোহরের অবস্থা দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'হঁস! তোমার এই অবস্থা হল কেন?' কে মেরেছে?'

দ্বিতীয় ছেলেটি আত্মরক্ষার জন্যে বলে উঠল, 'স্যার! ওই প্রথম হাত চালিয়েছে।' 'হাত চালিয়েছে! কেন? কেন মারল? কি করছিল তোমরা? লজ্জা করে না ছেলে হয়ে দলবঁধে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলতে! আজ দুজনকেই আমি টিপি দিয়ে দেব।'

'ও স্যার নিজেই কেনে মনে করে না?' প্রথমজন বলল। 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। মোহর, কেন তুমি ওকে মেরেছিলে। কি করেছিল?' 'কিছু করেনি স্যার।' মোহর মাথা নাড়ল। 'কিছু না করলে তুমি কেন ওকে মারতে যাবে? তোমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বলা।'

'আমি ভুল বুঝেছিলাম স্যার।' মোহর গৌজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেদুটো খুব অবাক হয়ে মোহরের দিকে তাকিয়েছিল। সম্ভবত নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা। 'ও।' হেডমাষ্টার মশাইকেও বিচলিত দেখাচ্ছিল, 'তাহলে ওদের বিরুদ্ধে তোমার কোনও অভিযোগ নেই?'

'না। বরং আমিই মাথা গরম করে ওদের প্রথমে মেরেছি।' সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছেলেটি বলে উঠল, 'স্যার, আমরা খারাপ কথা বলেছিলাম বলে—'

হেডমাষ্টার মশাই মাথার ওপর হাত তুললেন, 'এনাফ! অনেক হয়েছে। আমার সমনে থেকে সবাই বিদায় হও। তবে মনে রেখো এসব আমি কখনও বরদাস্ত করব না। এরকম ঘটনা যদি আর কখনও শুনি তাহলে সবাইকে দূর করে দেব স্কুল থেকে।'

মোহর বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। তার যাওয়া দেখে বোধহয় হেডমাষ্টার মশাইয়ের ক্রোধ আর একটু বাড়ল, 'শোন। আমার মনে হচ্ছে তুমি এই হতভাগাদের বিচলে। তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। নেত্রটা অ্যানুয়াল পরীক্ষায় প্রত্যেকটা পেপারের তোমার জন্যে পাশ মার্ক হল পঞ্চাশ। তার নিচে পেলে ফেল, প্রমোশন পাবে না। যাও।'

স্কুলের বারান্দা দিয়ে উড়িয়ে উড়িয়ে ইটছিল মোহর। এখন শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে। পেছন থেকে দৌড়ে এসে দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'এই, তুই আমাদের বাচালি কেন?'

'কে তাদের বাচিয়েছে?' না তাকিয়ে ইটছিল মোহর।

'তুই তো।'

ঘুরে দাঁড়াল মোহর, 'আয় না। একা একা লড়া। দল বঁধে মারপিট করিস লজ্জা করে না।'

প্রথম ছেলেটি চলে এসেছিল কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'হেডস্যারের কাছে চেপে না গিয়ে একথাটা বললেই পারতিস।'

'সেটা তোরা বুঝবি না।' আর দাঁড়াল না মোহর।

স্কুল থেকে বেরিয়ে ইটতে লাগল যতক্ষণ না নদীর ধারে পৌঁছায়। এখন বিকেল। এদিকে এসময় খুব কম লোক আসে। খোলা আকাশের নিচে সে শুয়ে পড়ল। অনেক রক্তম রং এখন আকাশের দখল নিতে চাইছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল হেডস্যারকে কণ্ঠাটা বলে দিলেই হত। উনি ওদের বকছিলেন দল বঁধে একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে বলে। এইজন্যই সে ওদের বাচিয়ে দিল। সময়সী যে কোনও ছেলের সঙ্গে সে লড়তে পারে। তাহলে তাকে এমন কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে কেন? তাই সে উল্টে কৃপা করল।

উঠে বসল মোহর। না, তাকে আরও গায়ের জোর বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে শিখতে হবে আত্মরক্ষার কায়দাগুলো। ধ্যানদার কথা মনে এল। হলদুপুরে ধ্যানদার একটা আঘড়া আছে। জুড়ো শেখান তিনি। ইউনিফর্ম পরে ছেলেরা তাঁর কাছে ট্রেনিং নেয়। দূর থেকে দেখেছে মোহর, কোনও দিন কাছে যায়নি। আঘড়া গেলে কেমন হয়। সে উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে বুমালা বের করতে গিয়ে হাতে কাগজটা ঠেকল। সেটা বের করতেই মেয়েটার মুখ মনে এল। রঞ্জনা। ও যদি ওভাবে এই কাগজটা তাকে না দিত তাহলে এমন কাণ্ড ঘটত না। সে কাগজটা খুলল। ওপরে একটা গোলাপ ফুল আঁকার চেষ্টা হয়েছে। তার নিচে গোটা গোটা অঙ্করে লেখা, 'তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, নইবা তোমার থাকল প্রয়োজন। কি দেব বল তো? কি? কি? কি?'

বাস এগুইল। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল মোহর। এর মানে কি? কি দিতে চায় তাকে? প্রেম? ওরা তখন প্রেম নিয়ে তার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসেছিল। মেয়েটার কাছে প্রেম আছে? দেখলে তো মনেই হয় না। মোহরের হঠাৎ একটা খারাপ লাগা তৈরি হল। তার নিজের কাছে তো প্রেম নেই। থাকলে বাঝা যেত। সে চিঠিটার দিকে তাকাল। ছেলেরা মেয়েদের প্রেম দেয়, মেয়েরা ছেলের। রঞ্জনা কেন তাকে প্রেম দিতে চাইছে? তাকে কি ও ছেলে ভাবছে? ভাবার কোনও কারণ অবশ্য নেই কারণ হলদুপুরের সবাই জানে সে মেয়ে। মোহর মাথা নাড়ল। তার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে। রঞ্জনাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা উচিত সে কি দিতে চাইছে?

ধ্যানদা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে ভাই?'

ভাই। ওকে কি ছেলে ভাবছেন ধ্যানদা? মোহর হাসল। পেছন থেকে ইউনিফর্ম পরা একটি ছেলে বলে উঠল, 'ওকে ভাই বলছেন কেন ধ্যানদা, ও মেয়ে।'

'ভাই শব্দটাকে কি আমার সবসময় পুরুষ অর্থে ব্যবহার করি? মেয়েরা তো নিজস্বের মধ্যে কথা বলার সময় বলে, না ভাই ধ্যান না। আসলে ভাই একটা স্নেহসূচক ডাক।' ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালেন ধ্যানদা, 'বলা।'

'আমি জুড়ো শিখতে চাই।'

'গুড। কিন্তু আমার এখন কোনও মেয়ে শিক্ষাধী নেই।'

'তাকে আমার কিছু এসে যায় না।'

'হঠাৎ তোমার এমন ইচ্ছে হল কেন? তুমি তো ফুটবল খেলা।'

'ফুটবল দলের খেলা। অন্যের ইচ্ছের ওপর খেলা নির্ভর করে।' মোহর সোজা হয়ে দাঁড়াল,

'তাছাড়া আমি আত্মরক্ষা করা শিখতে চাই।'

'করও সঙ্গে মারপিট হয়েছে।'

'হ্যাঁ। দৃষ্টান্ত একসঙ্গে বাঁপিয়েছিল বলে আমি পারিনি।'

'জুড়ো শিখাল দুইয়ের বেশি আক্রমণকারীকে সামলাতে পারবে। ঠিক আছে আমি তোমাকে এখানে নেব। কিন্তু মনে রেখো তুমি আত্মরক্ষার জন্যেই জুড়ো শিখবে।'

মোহর মাথা নাড়ল।

'বেশ। কাল পাঁচটার সময় এসে। আর হ্যাঁ, তোমার বাবা মায়ের আপত্তি নেই তো?'

‘আমি বললে বাবা না বলবেন না।’
 ধ্যানদা হাসলেন, ‘খুব ভাল। কাল এসো।’
 বাড়িতে ঢোকামাত্র সপাতো চড় পড়ল মোহরের গালে, সেইসঙ্গে চিৎকার, ‘কেন মারপিট করেছিস? মেয়ে হয়ে ছেলের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলি কি জন্যে? নিজের বয়স কত হল খোয়াল আছে?’

হেডমাস্টারের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিস কেন? বল বল। আজ তোকে আমি মেরেই ফেলব। ছেলে সেজে যোরা খোচাচ্ছি আমি।’ চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকতে লাগলেন না।
 ‘ঠিক আছে। ছেড়ে দাও।’ অমদা মুখার্জির গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে।

‘তুমি চুপ করো। তোমার আশ্চর্যায় মেয়ে এমন খিঙ্কি হয়েছে। এরপর বদ ছেলেগুলোর সঙ্গে বসে সিগারেট খাবে। বল, কেন প্রথমে তুমি ঘেরেছিলি? যাওয়ার গলা চিরে যাচ্ছিল।
 কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল মোহর। গালের জ্বলুনি অথবা চুল টানার যন্ত্রণাকে সে উপেক্ষা করে দাঁতে দাঁত চেপেছিল। তাকে কথা বলতে না দেখে মায়ের রাগ আরও বাড়ছিল। তিনি মুঠোয় শরা চুলের গোছাসুত্থ মাখাটাকে ঝাঁকালেন, ‘বল, কেন ঘেরেছিলি?’

‘ওরা খারাপ কথা বলেছিল।’ যতটা সম্ভব শাস্ত গলায় জ্বাব দিল মোহর।
 ‘কি খারাপ কথা?’ মা খির হলেন যদিও তাঁর হাত এখনও মোহরের মাথায়।
 ‘আ। ছেড়ে দাও না।’ অমদা মুখার্জি এদিয়ে এলেন।
 ‘এখন কথা বানাচ্ছে। খারাপ কথা বললে তো হেডমাস্টারের সামনেই বলে দিতে পারত। তোমার মেয়েকে আমার চিনতে বাকি নেই। বল, কি খারাপ কথা বলেছে?’

‘একটা মেয়ে নাকি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে?’ কেটে কেটে বলল মোহর।
 সঙ্গে সঙ্গে চুল ছেড়ে দিয়ে নিজের ঠোঁটে হাত নিয়ে গিয়ে শব্দ করলেন মা, ‘কি বললি?’
 ‘শুনো আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।’

‘কোন মেয়ে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে?’ কেটে কেটে বলল মোহর।
 ‘আমি জানি না। ওরা রসিকতা করছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছিল কথাগুলো খারাপ।’
 ‘নিশ্চয়ই খারাপ। বুঝি খারাপ।’ ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে তাকালেন, ‘এসব কথা তোমার স্কুলের ছাত্রীরা বলাবলি করে নাকি? মাগো!’ তারপরই মেয়ের দিকে ফিরলেন, ‘কথাটা হেডমাস্টারকে বললি না কেন? তখন কি হয়েছিল?’

‘বলতে আমার লজ্জা করছিল।’
 ‘লজ্জা করছিল। লজ্জা তো মেয়েদেরই হয়। তার মানে বুঝতে পারছ তুমি মেয়ে বলেই লজ্জা পেয়েছিলে। এখন থেকে আর ছেলের সঙ্গে মিশবে না। কাল থেকে স্ক্যাট পরে স্কুলে যাবে। অনেক বড় হয়ে গেছ তুমি।’

‘অসম্ভব।’
 ‘আবার মুখে মুখে কথা।’
 ‘এত ছোট চুল স্ক্যাট পরলে মেরোরা আমাকে শকুন বলে ডাকবে।’
 ‘শকুন?’
 ‘শরীরটা বড় আর মাথা ন্যাড়া হয় শকুনের।’
 অমদা মুখার্জি হেসে ফেললেন, ‘ঠিক আছে। আগে ওর চুল বড় হোক তারপর না হয় মেয়েদের পোশাক পরবে। যাও, ভেতরে যাও।’

মোহর গেল না। বলল, ‘বাবা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।’
 ‘কি কথা?’
 ‘আমি যতই বলি একটা ছেলের গায়ের স্কের শেষ পর্যন্ত আমার চেয়ে বেশি হবে।’

‘ঠিকই। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।’
 ‘হ্যাঁ। কিন্তু নিয়ম না বদলাতে পারলেও আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে পারি।’
 ‘কিভাবে?’
 ‘আত্মরক্ষা করার শিক্ষা নিয়ে। আমি জুড়ো শিখতে চাই।’
 ‘জুড়ো?’ মা হাততপ্প।
 ‘হ্যাঁ। আমি আজই ধ্যানদার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। উনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে তোমাদের অনুমতি আছে কি না। কাল যেতে বলেছেন।’

‘নেই। একদম নেই। একই তো মেয়েলি ব্যাপারগুলো দেখতে পাওয়া যায় না তারপর জুড়ো শিখলে তো কখনই নেই।’ মা বলে উঠলেন।
 ‘জুড়ো শিখলে কেউ আমার সঙ্গে লাগতে সাহস পাবে না।’
 ‘কোনও মেয়ে জুড়ো জানে শুনলে পাত্রপক্ষ এগোবে?’

‘পাত্রপক্ষ?’
 ‘তোমাকে তো বিয়ে দিতে হবে। জুড়ো শিখলে কেউ ধারে কাছে ঘেঁষবে না।’
 ‘মা তুমি বুঝবে না। বাবা, তুমি বলো।’
 অমদা মুখার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন। এককথায় ফুটবল ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটা যা তাঁর স্ত্রী

হাজার বার বলেও ছাড়তে পারেন নি। স্কুলের যারপিটের কথা পরে তিনি জেনেছেন। জেনে বিরক্ত যেমন হয়েছিলেন রেগেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাগ প্রকাশ করার সুযোগ পাননি ওর মা স্টো করায়। নিজে রাগ করে করে যা করা যায় অন্যকে সেই ভূমিকায় দেখালে তা আর করা যায় না। হেডমাস্টারমহিলা অবশ্য তাঁকে বলেছেন, ‘তবু আমি মেয়েটির প্রশংসা করব।’ উনি এখন পর্যন্ত কথাটাকে মনে নিতে পারছিলেন না। বললেন, ‘এ বছর তোমার পাশমার্ফ পঞ্চাশ। প্রামাণ্যে পোতে গেলে অন্য দিকে মন দেওয়া চলবে না।’

‘আমি তো কখনই বাটের নীচে পাই না। কিন্তু আমাকে আত্মরক্ষা করতে শেখাও। তোমরা তো সবসময় আমাকে ঝাঁচতে পারবে না। পাঁচটা ঝুঁকে ছা। তুমি আমার কথা রাখবে না?’

‘ঠিক আছে। শিখো দ্যাখো কত সিন ভাল লাগে।’ অমদা মুখার্জি মা বলে পারলেন না।
 মোহর হাসল, ‘ধ্যান ইউ বাবা। ধ্যানপাকে বলে এসেছিলাম আমি বললে তুমি মা বলবে না।’

একটা মেয়ে ভাল ফুটবল খেলে, বুটের ওপর কাঁপিয়ে বল ছোঁ মেরে তুলে নেয়, ভয়ভর কম কিস্তি জুড়ো শুধু সাহস থাকলেই শেখা যাবে না, শরীরটাকেও চাবুকের মত চালাতে হবে। হলদপুরের জুড়ো শিক্ষাবীর মনে হয়েছিল মোহর প্রথম দিনই কেটে পড়বে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটল না।

ধ্যানদাও অবাক হয়ে গেলেন। যা শেখাচ্ছেন তা রপ্ত করতে অন্যদের চেয়ে অনেক কম সময় নিচ্ছে মোহর। এক্সারসাইজ করার সময় কখনও বলছে না সে ক্লান্ত। খুব দ্রুত সে সিনিয়র ছাত্রদের কাছাকাছি উঠে আসছে। মেয়ে বলেই ধ্যানদা যা কিছু অনুশীলন মোহর করে নিজে তার সতী হন। অন্য ছেলেরের ওর সঙ্গে দেন না। শুধু জেন্দ আর নিষ্ঠা মেয়েটাকে আলাদা করে তুলছে বলে ধ্যানদার ধারণা। এখন তিনি ছাত্র শব্দটিকে উভয়লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। এমন হাত পেলে যে কোনও শিক্ষকের উৎসাহ বাড়ি।

মেহর জুড়ো শিখবে এই খবর হলদপুরের সবাই জেনে গেল। স্কুলের যেসব ছেলেরা ওকে মেয়ে ভাবতে চাইত তারা উদাসীন হল। যাদের সঙ্গে মারপিট হয়েছিল তারা এড়িয়ে যেতে লগল। আর উচ্চ ক্লাসের ছাত্ররা বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকতে লাগল, কেউ আঁখি ঘাটাইল না।

টিফিনের সময় মোহরের মনে পড়ল রঞ্জনার কথা। অনেক দিন হয়ে গেল চিঠিটা সে পেয়েছে কিন্তু তারপর আর ওর সঙ্গে কথা হয়নি। হয়তো সেই মারপিটের কথা জানার পর রঞ্জনা তাকে এড়িয়ে চলছে। চিঠিতে ও যা দিতে চেয়েছিল তা নিয়ে আর উভব্যতা করছে না। সে মেয়েদের দমলো দাঁড়ানো রঞ্জনার দিকে এগিয়ে গেল, 'রঞ্জনা!'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কেউ কেউ ঠোট টিপে হাসতে লাগল, বাকিরা গম্ভীর মুখে অন্যদের দিকে তাকাল। একজন বলল, 'এই রঞ্জনা, তোকে ডাকছে।'

রঞ্জনা যেন বিরক্ত এমন ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার?'

'তোরা চিঠিটা!'

হঠাৎ গলা নামাল রঞ্জনা, 'এখানে না। বিকেলে বাড়িতে এসো।'

'বিকলে আমার ছুতো ন্যাস আছে।'

রঞ্জনা দাঁড়াল না। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের কিছু বলতেই তারা শব্দ করে হেসে উঠল। ক্রাশে ফিরে এল মোহর। এখন সে হচ্ছে করলে স্কুলের মাঠে গিয়ে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটাই করছিল না। নন্দিনী বলে একটা মেয়ে বসেছিল ক্রাশে, বসে বই পড়ছিল।

কানে গিয়ে মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'কি পড়ছে রে?'

নন্দিনী দেখাল বইটা। বিতৃষ্ণত্বশ্রবণের চাঁদের পাহাড়। বইটা ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে মোহর।

চোখ বড় করে বলল, 'দারুণ!'

'ফ্যান্টা!'

'ফ্যান্টা মানে?' ছোটখাটো রোগা চশমাধারী মেয়ে নন্দিনীর চোখে বিস্ময়।

'ওঃ ফ্যান্টা মানে ফ্যান্টাস্টিক। তুই কালো ভ্রমর পড়েছিস?'

'হ্যাঁ। তুই গল্পের বই পড়িস?' নন্দিনী যেন খুব অবাক হয়ে গেছে।

'কেন? আমি কি পড়তে পারি না?'

'না! মাথা নেড়েছিল নন্দিনী, 'আমি তা বলছি না। আসলে তুই তো ছেলের মত বেলাখুলো করিস, বই পড়ার সময় হাতটা পাস না, এরকম তেবেলিলাম।'

'তার মানে ছেলেরা গল্পের বই পড়ে না?'

'আমার দাদা তো পড়ে না। বলে সময় নেই। দাদার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগে।'

গ্যাদাদার আখড়া এসে মোহর জানতে পারল একজন শিক্ষাবীর আকস্মিক হেঁচকে বলে তাকে নিয়ে তিনি হাসপাতালে গিয়েছেন। সবাই প্রশ্নে কি ভুল করেছে তা নিয়ে আলোচনা করছিল। প্রাণেশ নামের ছোট্ট একা একাই অনুশীলন করছিল। ছেলোটার বয়স অন্তত কুড়ি হবে। খুব চোয়ালে দেখতে। গায়ে যে জোরা আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। এখানে ওর কোনও বন্ধু আছে বলে মনে হয় না। ওকে কারও সঙ্গে গল্প করতে দ্যাখনি মোহর। প্রাণেশকে দেখলেই মোহর অদ্ভুত রকমের আকর্ষণ বোধ করে। প্রাণেশের শরীর, বেশভূষা ভাব এবং গুঁজাই হয়তো সেই আকর্ষণ তৈরি হতে সাহায্য করেছে। সেই প্রাণেশ আজ একা একা অনুশীলন করতে গিয়ে এমন বেকায়দায় পড়ে গেছে যে হাড় ভেঙে মাথোঁ আত্মাভাবিক নয়।

মোহরের খারাপ লাগছিল। একজন তাকে অনুশীলন করবে একথা জিজ্ঞাসা করার সে মাথা নেড়ে না বলে হাঁটতে শুরু করল। গ্যাদাদা বলেন, 'পৃথিবীতে কেউ অপরিহার্য নয়। কোনও কিছুই কারণ ছাড়া থেকে থাকে না। যে কাজ তোমার করার কথা, সেটাই মনে দিয়ে করে যাও, কোনও অঙ্কুহাতে মদি-স্বস্ত-সরিয়ে না। নাও তাহলেই সাক্ষ্য পাবে।' কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করে মোহর। তার মনে এখনই ফিরে গিয়ে তার অনুশীলন করা উচিত। একজনকে অপ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলে সে কেন ফাঁকি দেবে? এটা তো একটা অঙ্কুহাত। মোহর ফিরে এল। পোশাক পাশ্বে অনুশীলনে নামল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মগ্ন হয়ে গেল মোহর। গ্যাদাদার দেখিয়ে দেওয়া

মুভসেন্টগুলো একের পর এক শেষ করে মনে হল শরীরটা সহজ হয়েছে। আজকাল বিকলে অনুশীলন না করলে মনে হয় কি যেন বাকি থেকে গেল। আর তখন কিছুতেই স্থগিত হয় না।

এখন দেহিতে সন্ধে হয়। অল্পা মুখার্জি তাকে বলেছেন যেখানেই যাও সন্দের অন্ধকার নামার আগেই বাড়িতে ফিরবে। এখন বাড়িতে ফিরে স্নান না করলে কিছুই ভাল লাগবে না। জোরে জোরে হাঁটছিল। এখনও মাথার ওপর রোদ। শীত আর গ্রীষ্মের মধ্যে কি ফারাক।

হঠাৎ মুখ জ্বলতে সে রঞ্জনাকে দেখতে পেল। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। মোহর দাঁড়াল। রঞ্জনাদের বাড়িটা দোতলা। অবস্থা বেশ ভাল। সে ইতস্তত করে একটু এগিয়ে যেতে দুজন মানুষকে দেখতে পেল। বয়স্ক দুই নারী পুরুষ বারান্দার চেয়ারে বসে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে বেশ বিস্ময় ওঁদের চোখে।

'তুমি?' মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার নাম মোহর। রঞ্জনার সঙ্গে পড়ি।'

'ও, তুমিই মোহর। তুমি তো ফুটবল খেলতে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন খেলা না?' মহিলার নেন অসীম কৌতুহল।

'না।' মোহর তেতরের দিকে তাকাল কিন্তু রঞ্জনাকে দেখতে পেল না। অথচ রঞ্জনাই তাকে ডেকেছে।

এবার পুরুষটি বললেন, 'তোমার কথা আমি শুনেছি। খেলাও দেখছি। তোমাকে দেখে কে বলবে তুমি মেয়ে। এখন তোমার উচিত নিজেকে চেনে করা। অবশ্য তোমার বাবা মা তাল বুঝবেন।'

মহিলা বললেন, 'রঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? যাও, ও ভেতরেই আছে।'

মোহর ভেতরে ঢুকল। চারপাশে সাচ্ছল্যের চিহ্ন ছড়ানো। এই সময় সে রঞ্জনাকে দেখল। আর একটা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল সে।

মোহর বলল, 'কি বলবে বলে। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, সন্ধে হয়ে এসেছে।'

'মোটেরই না। এখনও দেরি আছে। আমার ঘরে চলে।' রঞ্জনা হাঁটতে লাগল। ওকে অনুসরণ করে দোতলায় চলে এল মোহর। একতলায় একজন কাজের লোক নজরে এসেছিল। দোতলা ফকা, রঞ্জনার ঘরটা সুন্দর। জানলায় রঙিন পর্দা টানা। সে বলল, 'বসো।'

মোহর বসল। রঞ্জনা আবার হাসল, 'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।'

'আমাকে? সারা শরীরে ঘাম। ঠান্ডা করছ?'

'মোটেরই না। ঘাম বলেই ঠিক ছেলে ছেলে মনে হচ্ছে। অবশ্য ছেলে হলে মা বাবা তোমাকে ভেতরে ঢুকতেই দিত না। আমার বয়ে গেছে সত্যিকারের ছেলের সঙ্গে মিশতে।' রঞ্জনা হাসল।

মোহরের মনে হল ক্রাশের যে রঞ্জনাকে সে দ্যাখে তার সঙ্গে এখনকার রঞ্জনার কোনও মিল নেই। নীলচে স্ফটিক পরা এই রঞ্জনা অনেক পুতুল পুতুল। মুখচোখে গোলাপি আভা।

মোহর বলল, 'কি বলবে বলে।'

'আমি তোমাকে চিঠি লিখেছি বলে শ্যামলরা খুব রগে গিয়েছিল? তোমাকে মেরেছিল?'

মোহর মাথা নাড়ল। মুখে কিছু বলল না।

'কি জেলাস। তুমি কি চিঠিটা দেখিয়েছ?'

'না। কিন্তু চিঠির মানে কি?'

রঞ্জনা জবাব না দিয়ে চট করে পর্দা সরিয়ে বইরটা দেখে নিল। তারপর নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'তুমি বোঝনি।'

'না।'

আমাকে চাই ২

‘তুমি একটা যাচ্ছেতাই। হঠাৎ কাছে ছুটে এল রঞ্জনা। বসে থাকা মোহরের মাথাটা বুকে চেপে ধরে বলল ফিসফিস করে, ‘আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ।’

বুকে গাল চেপে থাকায় অস্বস্তি যেমন হিচ্ছিল তেমনি আর এক ধরনের নরম অনুভূতিতে আক্রান্ত হল মোহর। সে অনুভব করল রঞ্জনার শরীর তার চেয়ে অনেক বাস্তব। কোনমতে মাথা নামিয়ে সে বলল, ‘এই কি হচ্ছে?’

একটু সরে দাঁড়াল রঞ্জনা, ‘আমাকে তোমার ভাল লাগে না?’

মোহর তাকিয়ে থাকল। রঞ্জনা গাঢ় গলায় বলল, ‘আমি কি দেখতে খারাপ?’

‘না। তুমি তো সুন্দরী।’

‘তাহলে? তোমাকে আমার ভাল লাগে, আমাকে তোমার ভাল লাগবে না কেন?’

‘আমি কি বলেছি খারাপ লাগে?’

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে অদ্ভুত উল্লাসের শব্দ উচ্চারণ করল রঞ্জনা। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, ‘তাহলে কথা দাও আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না?’

‘বাঃ। এরকম কথা কি করে দেব? আমি তো বারাকে খুব ভালবাসি।’

‘ও। বাবা মায়ের কথা বলছি না। অন্য কোনও মেয়েকে—!’

‘বেশ!’

‘শুকলে কিন্তু আমরা কথা বলব না। কেউ জানতে পারবে না আমাদের কথা। শুধু সপ্তাহে তিন দিন তুমি এ সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। না, তিন নয়, চার দিন। প্রমিশ?’

‘শীতকালে পারব না। সন্ধে হয়ে যাবে।’

‘শীতকাল অনেক দেরি আছে। উঃ, আমার আজ কি ভাল লাগছে। এই, তোমার কি এটা ফাস্ট লাভ?’

মোহর আচ্ছন্নের মত বলল, ‘হ্যাঁ!’

রঞ্জনা পায়ে পায়ে কাছে এল। তারপর বলল, ‘তুমি কি?’

‘কেন?’

‘আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নিজে না কেন?’

মোহরের মনে পড়ে গেল চিঠিটার কথা। সে বলল, ‘জিনিসটা কি তাই বুঝলাম না?’

‘তোমাকে নিয়ে আর পারি না। দাঁড়াও।’ রঞ্জনা দৌড়ে চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। পছন্দ করে একটা লিপস্টিক ভুলে নিয়ে পারশর বাথরুমে ঢুক গেল। হঠাৎ মোহরের মনে হল সে মনে সত্যি আর মেয়ে নয়, ছেলে হয়ে গিয়েছে। রূপকথার রাজকুমার হয়ে নীলবরনা রাজকুমার কাছে এসেছে। সে মেয়ে বলে কেউ এখানে অনুকম্পা করার জন্যে বসে নেই।

রঞ্জনা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। মোহর দেখল ও মুখ ধুয়ে ফেলেছে। লিপস্টিক রেখে দিয়ে ও একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল, ‘রাতে ঘুমাবার আগে খুলে দেখবে।’

‘কি আছে এতে?’

‘বললাম তো। ধরো এতে যোল আছে। খুশি?’

কাগজের ভাঁজ খুলতে ইচ্ছে হলেও সেটাকে পকেটে ঢোকাল মোহর। তারপর বলল, ‘মাই!’

‘মাই বলতে নেই, আসি বলে।’

মোহর হেসে বলল, ‘আসি?’

নীচে রঞ্জনার বা এংব বাবা বসেছিলেন একইভাবে। মোহরকে চলে যেতে দেখে রঞ্জনার বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘লান্ট পেরীকায় তোমার পার্সেন্টেজ কি রকম ছিল?’

‘সিরিটি ফাইভ।’

‘বাঃ ভাল। তবে আরও বাড়ানো দরকার। রঞ্জনার সঙ্গে পড়াশুনা নিয়ে কথা বললে?’

‘হ্যাঁ।’



মাঝে মাঝে এসে। আলাচনা করলে দুজনই উপকৃত হবে।’

তখন অঙ্কুর নামব নামব করছে। মোহর দৌড়াতে লাগল। সময়কে হারাতে সে মরিয়া হয়ে দৌড়াছিল। ইদানীং অনশীলনে থাকায় তার শরীর এখন অনেক হালকা হয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই সে নিজের নামটা শুনতে পেল। ও মুখ ফিরিয়ে দেখল শান্তিবাবু, ওদের গেমটিচার আর অম্মদা মুখার্জি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। অতএব দাঁড়াতে হল। অম্মদা মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওভাবে ছুটছে কেন?’

‘সন্ধে হয়ে গেছে।’ মাথা নামাল মোহর।

‘ও ওটা একটু আগে খোলা করলে এভাবে দৌড়াতে হয় না।’ অম্মদা মুখার্জি শান্তিবাবুর দিকে তাকালেন, ‘শুনছি একটা লোক পেছনে বাধ দেখে এমন গতিতে দৌড়েছিল যা কার্ল লুইস কোনও দিন পারেনি। আবার মেয়ের সেই দশা। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফেরার কথা, যেহেতু হনুমানের মত সৃষ্টিকে বগলে আটকে রাখতে পারেনি তাই ওভাবে দৌড়ে ছেলেছে।’

শান্তিবাবু বললেন, ‘কিন্তু খুব ভাল। স্টেপটিং সামান্য ঠিক করে দিতে পারলে ও চ্যাম্পিয়ান হবে।’ হ্যাঁয়ে, তুই লম্বা হয়েছি মনে হচ্ছে?’

অম্মদা মুখার্জি বললেন, ‘হ্যাঁ, জুড়োর ক্লাশে ভর্তি হবার পর চ্যাম্পা হয়েছেন।’

শান্তিবাবু বললেন, ‘কাল স্কুল ছুটির পর আর আমার সঙ্গে দেখা করবি?’

ছাড় নেড়ে হীরে হীরে বাড়িতে ফিরে গেল মোহর।

মোহরের এখন নিজস্ব ঘর হয়েছে। দেওয়াল জুড়ে অনেকের পোস্টার সঁটা। সবচেয়ে বড় পোস্টার ছিল লেভে ইয়াসিনের। সেই জায়গাটা এখন খালি। পেলে মারাদোনো থেকে মাইকেল জ্যাকসন এখনও ভাবডাব করত তাকিয়ে থাকেন সারাক্ষণ। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে কাগজটা খুলল। খুলে অবাক সে।

ঠিক মাঝখানে লাল লিপস্টিক দিয়ে তোলা টোন্টের ছাপ। নিটোল দুটো কমলালেবুর কোয়ার মত। তলার লিপস্টিক দিয়ে দেখা ‘টেক ইট।’

অদ্ভুত আচ্ছন্ন হয়ে গেল মোহর। তাহলে এটাই দিতে চেয়েছিল রঞ্জনা? দুটো টোন্টের ছবি? চিনিচিনি অনুভূতি ছড়িয়ে যাকছিল শিরায় শিরায়। রঞ্জনাকে খুব ভাল লাগছিল এখন। তার নিজের কোনও ভাই নেই বলে নেই যে তাদের দুহাত জড়িয়ে আদার করতে পারে। মা বাবা এখন যেন অনেকটা দূরে। এই মুহুর্তে ওর ইচ্ছে করছিল রঞ্জনাকে আদর করতে।

একটা অরুণ ভাব, বুকের ভেতর উখাল পাখাল, বিকেল হলেই রঞ্জনার বাড়ির তীর আকর্ষণ যেন কদিন ধরে আচ্ছন্ন করে রাখল মোহরকে। তার মনে হতে লাগল রঞ্জনা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনও আপনজন নেই। রঞ্জনার ওপরের ঘরে পৌঁছানো মাত্র সে অসাড় হয়ে যায়। কাছে পিঠে কেউ না থাকলে, রঞ্জনা যখন তাকে আদর করে তখন ঘরে যথোদ্যম ইচ্ছে জাগে। কি সুখ, কি সুখ। একটা কথা সে কাউকে বলতে পারবে না যে তার চেয়ে অনেক বেশি রঞ্জনা জ্ঞান। রঞ্জনা নাকি ওসব বই পড়ে শিখেছে। ওদের বাড়িতে ছোটদের বই পড়া নিয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। ওর ঘরেই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলি আছে। তার একটা পাতা খুলে পড়েছিল রঞ্জনা। কিরণময়ী দিবাকরের শীতল ওঠে চুপন করে বিলিবিগিয়ে হেসে উঠেছিল। রঞ্জনা গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, ‘বলো তো, শীতল ওঠে মানে কি?’

‘ঠাণ্ডা টোণ্ডা। চটপট জ্বাব দিয়েছিল মোহর।

‘টোণ্ডা কখনও ঠাণ্ডা হয়?’

ভেবে কুল পায়নি মোহর। রহস্যময়ীর মত রঞ্জনা বলেছিল, 'প্রথম দিন তোমার ঠোট শীতল ছিল। একেবারে বরফ। বুঝলে মশাই!'

মাঝে মাঝে পড়াশুনার কথা ওঠে বটে কিন্তু রঞ্জনা সেটা চাপা দেয় অন্য প্রসঙ্গ টেনে। একই সঙ্গে তার মা এবং বাবার কাছে অভিনয় করতে একটুও দ্বিধিত হয় না। অথচ স্কুলে সে এমন ভান করে যেন মোহরকে চেনেই না। মোহরের দিকে আড় চোখেও তাকায় না। কোনও বিকলে সে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মোহর বিব্রত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হল তোমার?'

'আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।' ঠোট ফোলাল রঞ্জনা।

'কেন? আমি কি করেছি?'

'ওই রোগা প্যাংকো নদীতীর মধ্যে কি পেয়েছ যে অতক্ষণ গল্প করতে হবে?'

নলিনীর মুখ মনে পড়তেই হেসে ফেলল মোহর, 'ওমা। আমাদের গল্পের বই নিয়ে কথা বলছিলাম!'

'গল্পের বই? তুমি গল্পের বই পড়ো?'

'হ্যাঁ। আমি বই না পড়লে রাত্রে ঘুমতে পারি না।'

'আমি পড়ি না।' কাছে এল রঞ্জনা, 'অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেবলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আর শোন, তুমি কখনও ওমা বলবে না।'

'কেন?' মোহর অবাক হয়ে তাকাল।

'ওমা কথা মেয়রা বলে। তুমি বলবে কেন?' দু হাতে জড়িয়ে ধরল রঞ্জনা।

অমদা মুখার্জি এক সকালে মেয়েকে ডাকলেন, 'তোর কি হয়েছে?'

মোহর তাকাল, 'কেন? কি আবার হবে।'

'তোর চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আয়নারা দেখিস না?'

মা পাশেই ছিলেন। বললেন, 'আরও জুড়ো শেখাও, চেহারা থাকবে কি করে?'

অমদা মুখার্জি গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার মেয়ে অনেকদিন জুড়ো ক্লাসে যায়নি। মোহর, তুই আমাকে তোর কি প্রত্নে খুলে বল। ধ্যান এসেছিল আমার কাছে। ও খুব দুঃখ পেয়েছে। তুই তো এখন ইনসিনিয়ার কখনও ছিলি না?'

মোহর ওপরের দিকে তাকাল, 'আমার কিছু হয়নি।'

'তোর এবারের পরীক্ষার রেজাল্ট জানিস? ফিফটি থ্রি পারসেন্ট। অত পঞ্চাশ। আর এক নম্বর কম পেলে প্রমোশন আটকে যেত। হাফ ইয়ালিতে বারিশা পেয়েছিলি। একটা মানুষ যখন নীচে নামে তখন তার প্রতিক্রিয়া সব দিক দিয়ে হয়। ফুটবল ছেড়ে দিয়েছিস বলে কি তোর কোনও কিছু করতে ভাল লাগছে না?'

'না, তা নয়—'

'আমি খবর পেলাম তুই কারও সঙ্গে গিয়েস না। স্কুলেও কারও সঙ্গে কথা বলিস না। বিকলে শুধু ক্লাসের একটা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকিস। এভাবে তো চলবে না। সবায় সঙ্গে মিশতে হবে, নর্মাল মানুষের মত জীবন যাপন করতে হবে।'

ঘরে কিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল মোহর। নর্মাল মানুষের মত জীবনযাপন করতে হবে। তাহলে কি আমি নর্মাল নই? আর পাঁচজনের সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়? রঞ্জনার কথা মনে পড়ল। রঞ্জনা তার প্রেমিকা, সে প্রেমিকা। এটা কি নর্মাল নয়? প্রকৃতি তাকে নারী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে একথা ঠিক কিন্তু সে তো একটা পুরুষের মত আচরণ করতে পারে। আচ্ছা, শুধু পুরুষই নারীর সঙ্গে প্রেম করবে একথা কোথায় লেখা আছে? দুটো মানুষ পরস্পরকে

ভালবাসতে কেন পারবে না? তা কি নর্মাল হবে না? মার্টিনা নাকি একজন নারীর সঙ্গে বসবাস করে স্বামী-স্ত্রীর মত। সেটা কি সবাই মেনে নেয়নি? অবশ্য বলা যেতে পারে বিদেশে আজ যেটা মানছে এদেশে আগামী কাল তা মানবে। সেটা না জানার আগে সবাই অ্যাননর্মাল ভাববে।

কিন্তু রেজাল্ট এত খারাপ হল কেন? এই ব্যাপারটা বিশ্রী লাগছে। হেসে খেলে লিখে তো যাট পাওয়া যায়। রঞ্জনার রেজাল্ট কেমন হল? না, এবার রঞ্জনার কথা সবসময় সে ভাববে না। বেশি ভালবে পড়াশুনার কতি হয়। আর জুড়ো! কীপরে পড়ল মোহর। এখনও তার ইচ্ছে যে কোনও দিন জুড়ো ক্লাসে চলে যাবে। যাব যাব করে দেরি হয়ে গেছে বেশ। আসলে রঞ্জনার কাছে যেতে গেলে জুড়ো ক্লাসে যাওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে। মোহর ভেবে পেল না সে কি করবে? তার কেবলই মনে হচ্ছিল বাবা যেন সব দেখতে পাচ্ছেন।

সেদিনই রেজাল্ট বের হল। কার্ড হাতে নিয়ে মোহর পড়ল ফিফটি থ্রি পারসেন্ট। মন্তব্য কলমে লেখা হয়েছে, 'অমনোযোগের কারণে মান নিম্নমুখী হয়েছে।'

এইবার কেউ তাকে হারাননি। ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়নি বলে দুঃখ, অপমান হয়েছিল কিন্তু সেটা অন্যেরা জোর করে তাকে করেছে। কার্ডটা হাতে নিয়ে তার মনে হল সে নিজেই নিজেকে হারিয়ে দিল।

বিকল এলে মোহরের মনে হল ভালবাসা একটা অসুখের মত ব্যাপার, যার কোনও গুণধূই নেই। এখন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সবাই জানতে পারে ক্যানসার কিংবা এইডসের কোন গুণধূ আবিষ্কৃত হয়নি। ভালবাসার গুণধূ কেউ কি আবিষ্কার করেছে? নইলে এই সময়টা হলেই রঞ্জনার বাড়ি তাকে এমনভাবে টানবে কেন? সে নিজেকে বোঝাল রঞ্জনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই তার যাওয়া দরকার। আজ ক্লাসে রঞ্জনা যথারীতি তার সঙ্গে কথা বলেনি। ওর রেজাল্ট কেমন হয়েছে তাও জানতে পারেনি সে। এখন থেকে সপ্তাহে একদিন দেখা করবে তারা এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

দূর থেকে রঞ্জনার বাড়িটা দেখতে পেয়ে সে রোমাঞ্চিত হল। রোজ তার আসার সময়ে রঞ্জনা দেওলার বারান্দায় অথবা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে, আজ নেই। বারান্দায় রঞ্জনার বাবা একাই বসেছিলেন। ওকে ঢুকতে দেখে বললেন, 'দাঁড়াও।'

মোহর দাঁড়াল। কোনও দিন জলদোক তাকে দাঁড়াতে বলেন না, আজ অস্বস্তি হল।

'তোমার রেজাল্ট কি রকম হয়েছে?'

'ভাল নয়।'

'কত পারসেন্ট?'

'ফিফটি থ্রি।'

'আর রঞ্জনার কত হয়েছে জানো? ফরটি টু। এত পুঁওর রেজাল্ট ওর হল কেন?'

মোহর হতভম্ব। এত কম নম্বর পেয়েছে রঞ্জনা?

'উত্তর দাও। রোজ বিকলে এখানে এসে কি পড়াশুনা করো তুমি যে রেজাল্ট মুখেও উচ্চারণ করা যায় না? তুমি আসার আগে ও প্রায় সিরিট পারসেন্ট পেত। সেই মেয়ের এমন অধঃপতনের জন্যে তুমি দায়ী।'

মোহর মাথা নিচু করল। কি জবাব দেবে সে?

'আমড এগুলো কি? পকেট থেকে গোটা চারেক কাগজ বের করলেন অল্লোল। বুঝতে পারল না মোহর। অবাক হয়ে তাকাল।

'উত্তর দাও।'

'ওগুলো কি?'

‘চিঠি। কোনও ছেলে লিখলে বলতাম প্রেমপত্র। তার ভবিষ্যতের ব্যায়েটা বাড়িয়ে দিতাম আমি। রঞ্জনার কাছে ছিল, ওর মা পেয়েছে।’
রঞ্জনা বলেছে ওগুলো তোমার লেখা। পড়ে গা গুলিয়ে ওঠে। তোমার বাবা মাস্টারমশাই, বিশিষ্ট ডব্রলোক, আর তার মেয়ে হয়ে এমন কুৎসিত চিঠি লিখেছে তুমি রঞ্জনাকে? উদ্বেজিত হয়ে উঠলেন ডব্রলোক।

‘বিশ্বাস করুন আমি রঞ্জনাকে কখনও কোনও চিঠি লিখিনি।’
‘এগুলো তুমি লেখোনি। নিজের নাম তলায় না লিখে খুব চালাকি করেছে বলে ভাবছ? হাতের লেখা মেলাতেই ধরা পড়ে যাবে।’
‘আপনি হাতের লেখা মোলালে নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।’
‘চমৎকার। আমি সেটা করতে গেলে হলুদপুরের কারও আর জানতে বাদ থাকবে না ঘটনটা।’

এইসময় ভেতর থেকে রঞ্জনার মায়ের গলা ভেসে এল, ‘এত কথা না বলে ওকে বিদেয় করে। জানিয়ে দাও এ বাড়িতে ফেল আর কখনও না পা দেয়।’
মোহর ঠোট কামড়াল। তারপর রাসারি জিজ্ঞাসা করল, ‘রঞ্জনা আপনাদের বলেছে ওইসব চিঠি আমি লিখেছি? আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘নো। কোনও কথা নয়। ওকে তুমি আর কখনও ডিসটার্ব করবে না। তেমন হলে আমি হেডমাষ্টারের কাছে যাব। গেট আউট।’ বৈঠে দাঁড়ালেন ডব্রলোক।

চুপচাপ মাথা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল মোহর। অপমানে, দুঃখে চোখে অশ্রুকার দেখাছিল সে। তার শেষ কোথায়? রঞ্জনা তাকে ডেকেছিল বলেই সে এ বাড়িতে এসেছিল। ওর বাবা নিজের মেয়েকে বলতে পারতেন যা বলার। তাকে বলতে গেলেন কেন? সে যদি ডব্রলোককে সব কথা খুলে বলে দিত? হঠাৎ তার মনে হল উনি সেকথা বিশ্বাস করতেন না।

সোজা বাড়িতে ফিরে এল সে। কারও সঙ্গে কথা না বলে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এখন তার মনে হচ্ছে রঞ্জনা নিজেকে বিচার্যার জন্যে তার নামে দোষ চাপিয়েছে। এটা কেন করল রঞ্জনা। কিন্তু ওই চিঠিগুলো? ওগুলো তো সে কখনও লেখেনি। ওর বাবা বললেন খুব খারাপ খারাপ কথার প্রেমপত্র। খারাপ কথা দিয়ে প্রেমপত্র লেখা যায় নাকি? ওগুলো কে লিখেছে রঞ্জনাকে? অন্য কোনও মেয়ে? নাকি ছেলে? প্রেমসেব ব্যাপারে রঞ্জনা তার থেকে অনেক বেশি জানে। সেই জানাটা কি ও অন্য কারও কাছে জেনেছে যে ওই চিঠি লিখেছিল? এবার নিজেকে প্রতারণা বললে মনে হচ্ছিল তার। মোহর কঁপে ফেলল।

পায়ের আওয়াজ কানে আসেনি। হাতের স্পর্শে সে সচকিত হল।
অন্নদা মুখার্জি বললেন, ‘ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই। এই যে চোখের ছল ফেললে এইটে তোমাকে সারা জীবন মনে রাখতে হবে।’

মোহর হঠাৎই মুখ ফিরিয়ে বাবার কোলে মুখ ঝাঁকে ছুঁ করে কঁদে উঠল।
মাখায় হাত বোলালেন অন্নদা মুখার্জি, ‘ঠিক আছে। তুমি বুঝতে পারলে নেমে গেলে কি রকম খারাপ লাগে? নিশ্চয়ই কোথাও তোমার ত্রুটি ছিল। সেই ত্রুটিটা মুছে বের করো। সিরিয়াস হও, সিনসিয়াস হও। তাহলেই হবে।’

চোখ বন্ধ, বুকে কাঁপুনি। সে যে জন্যে কান্দছে তা অন্নদা মুখার্জির জানার কথা নয়। কিন্তু মোহরের মনে হচ্ছিল বাবাকে সে কখনই বলতে পারবে না সিনসিয়াস এবং সিরিয়াস হওয়া সঙ্গেও রঞ্জনা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে চুপচাপ বাবার আদর পেতে পেতে তিক্ত করল দ্বিতীয়বার ওই এক অসুখে আর কখনও আক্রান্ত হবে না।

‘হ্যানদা ওকে দেখে খুব গম্ভীরভাবে তাকালেন, ‘কি ব্যাপার?’
‘আমি আবার শিখতে চাই।’
‘না। আমি ইনসিনসিয়াস ছাত্রদের পছন্দ করি না।’
‘আমি এখন থেকে আর ঠাঁকি দেব না।’
‘ভবিষ্যতে কি করবে তা জানতে চাই না, কেন এতদিন আসেনি তার কৈফিয়ত কি!’
‘পড়াশুনা—’ বলতে গিয়ে থেমে গেল মোহর। মনে হল মিথ্যা কথা বলছে।
‘ধামসে কেন? খুব পড়াশুনা করেছে তাই সময় পাওনি। তাই?’
‘আমি কমা চাইছি।’
‘তুমি এখানে আসেনি অথচ রোজ বিকেলে আড্ডা মারতে গিয়েছ।’
মোহর জবাব দিল না। অন্যদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হ্যানদা। সেখানে কয়েকটা ছাত্র অনুশীলন করছে। ওরা সিনসিয়াস। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ্যানদা বললেন, ‘এখানে যা শিখছে মনে আছে?’
‘হ্যাঁ।’
‘শরীরে স্টো নিতে পারবে?’
‘পারব।’
‘তাহলে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। যদি দেখি সব ঠিক আছে তাহলে সুযোগ পাবে।’
হ্যানদা তালি বাড়িয়ে ছেলগুলোকে ডাকলেন। ওরা কাছে এলে একজনকে বললেন, ‘বিনোদ, তুমি মোহরকে আটক করবে। ও নিজেকে সামলাক। যাও, মোহর তৈরি হয়ে এসো।’
তৈরি হতে হতে মোহর বুঝল তার কপালে দুর্ভাগ্য আছে। বিনোদ বেস্টের জন্যে তৈরি হচ্ছে। খুব ভাল জুড়ে জানে। ওকে সামলাবার জন্যে কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় হ্যানদা বলতেন না। আজ নেহাতই রোগে গিয়ে এই পরীক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু যা হয় হোক, সে পিছিয়ে যাবে না। মোহর তৈরি হল।

বিনোদকে কিছু বলছিলেন হ্যানদা আলাদা দাঁড়িয়ে। অন্য ছাত্ররা মজা দেখার মত মুখ করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যানদার নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিনোদ তাকে আক্রমণ করল। কিছু বোঝার আগেই মাটিতে ছিটকে পড়ল মোহর। ছেলগুলো হেসে উঠল। ধীরে ধীরে উঠে বসল মোহর। সোজা হসে দাঁড়াতেই মোহর এগিয়ে এল দু’হাত কোমরের সামনে তুলে ধরে। ও মূরছে। পাক ধোয়ে পা তুলবে। মোহর চকিতে সরে গিয়ে পায়ের পছেনে আঘাত করল। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল বিনোদ এবং প্রায় ডিম্বাকৃতি ষাওয়ার মত লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। শেষ মুহুর্তে নিজে পড়তে পারল মোহর। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার মুহুর্তে বিনোদের পায়ের আঘাত লাগল তার নিতম্বে। একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। হ্যানদা বললেন, ‘স্টপ।’

বেশ মন্ত্রণা হচ্ছিল শরীরে। হ্যানদা কাছে এসে ওকে তুলে ধরলেন। এইসময় স্কোরে হাততালির আওয়াজ হল। দেখা গেল, উল্টোদিকে একা দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে প্রাণেশ। এখন আর তার শরীরে প্রাণেশ নেই। প্রাণেশ বলল, ‘কি রে বিনোদ, একটা মেয়ের সঙ্গে খুব লড়াইয়ে।’
মুহুর্তেই মোহরের মনে হল বিনোদের কাছে পরাজয়টা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু প্রাণেশ তাকে অবহেলা করছে। সে হ্যানদার দিকে তাকাল। হ্যানদা তখন এগিয়ে গিয়েছেন প্রাণেশের দিকে, ‘তুই ওভাবে কথা বলছিস কেন? বিনোদকে আমিই বলেছি মোহরের সঙ্গে লড়াতে?’
‘কেন? একটা নভিসের সঙ্গে ওকে লড়াতে বলেছেন কেন?’
‘সেটা তুই বুঝবি না।’

‘আপনার অনেক কিছুই আমি বুঝি না।’ প্রাণেশ অদ্ভুত হাসল, ‘বিনোদকে আপনি ফেবার করেন।’

‘ফেবার করি? কি করে বুঝলি?’
প্রাণেশ উদাস মুখে ওপরে তাকাল। এই ভাকনোটা ভান। মোহর ওর ঠোটে হাসি দেখতে পেল। ধ্যানদা বললেন, ‘শোন প্রাণেশ, তুই যখন আর প্রাকটিস করবি না বলে ঠিক করেছিস তখন আর এখানে আসবি না।’

‘আপনি না বললে আসব না। মেয়েছেলেকে প্যাঁদাচ্ছে বিনোদ এটা বলা যদি অপরাধ—’
প্রাণেশের কথা শেষ হবার আগেই মোহর চিৎকার করে উঠল, ‘মেয়েছেলে মানে?’
প্রাণেশ মোহরের দিকে তাকাল, ‘মেয়েছেলে মানে মেয়েছেলে।’

‘মেয়েছেলে বললে বেশ তচ্ছল্য করা হয়, তাই না?’
‘যা সত্যি তা বলা কিয়ই অন্যায় নয়।’
‘ঠিক আছে। আপনি আমার সঙ্গে লড়ুন।’
প্রাণেশ বলল, ‘কেন মিছিমিছি মার খাবে। আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না।’
‘আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি।’ সোজা হয়ে দাঁড়াল মোহর।

ধ্যানদা মাঝখানে ছিলেন, বললেন, ‘নো। প্রাণেশের হাতের হাড়ে চির ধরেছিল। প্লাস্টার করা হয়েছিল। ওর উচিত হবে না আবার কারও সঙ্গে লড়া।’

মোহর বলল, ‘তাহলে ওকে বলুন তচ্ছল্য করে কথা না বলতে।’
‘এটা ভাই আমি জীবনভর করে মার। ব্যাটাছেলে মানে মদদ আর মেয়েছেলে মানে দুর্বলা।’
কি ধ্যানদা, আমি ভুল বলছি? বেশ, চলে এসো। এমন শিক্ষা দেব—’

‘নো। আমার এই জায়গা মারপিট করার জন্যে তৈরি করিনি। তোমরা জুড়ো শিষ্য আত্মরক্ষা করার জন্যে, লড়াই করার জন্যে নয়।’ ধ্যানদা চিৎকার করলেন।

মোহর এগিয়ে গেল ওর দিকে, ‘আমি তো আত্মরক্ষাই করছি। উনি আপনাদের সবার সামনে আমাকে আক্রমণ করছেন আর আমি আত্মরক্ষা করব না?’

‘যা হচ্ছে তাই করো। তুমি কতটুকু শিখেছ যে ওর সঙ্গে পারবে? শুধু জেদ থাকলেই জীবনে জেতা যায় না, জেতার জন্যে যোগ্যতা দরকার হয়। প্রাণেশ, ইউ গোট আউট।’

প্রাণেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। অবহাওয়া এখন ধুমধামে। ধ্যানদা ঘুরে দাঁড়ালেন, ‘ঠিক আছে, আজ থেকে প্রাকটিস শুরু করে দাও। আর যেন গাফিলতি না দেখি।’

শরীর বলছে তুমি নারী। সেই কারণেই প্রকৃতি তোমাকে পুরুষের থেকে আলাদা করে গঠন করেছে এবং লালনও। তুমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কত দিন যেতে পার?’

দ্বাদশের সময় এমন ভরনা মনে এলেই মোহর প্রতিবাদ করে, ‘আমি পারি।’ একটি পুরুষের সঙ্গে নারীর আপাত পার্থক্য বুক এবং নিতম্বে। নিয়মিত খেলাধুলো ও অনুশীলন কমায়ে তার নিতম্বে দেখামুখে জমতে পারেনি। ছিপছিপে লম্বা শরীরে সেই কারণে বুকের বাড়তি অহঙ্কার নেই। যা হয়েছে, যা কোনও দিন অস্বীকার করতে পারবে না মোহর তাকে প্রকট হতে না দেবার চেষ্টা সে অত্যাশে এনে ফেলেছে। প্রকৃতি নারীর বুক সৃষ্টি করেছে সন্তানের খাদ্যাভ্যন্তর পর্যায় করতে। কিন্তু এখন পৃথিবীর অর্ধেক নারীরা খাদ্যাভ্যন্তর হিসেবে বুক ব্যবহার করতে চায় না। তাদের লম্বা থাকে সৌন্দর্যবর্ধনে। আর এই হচ্ছের পেছনে একটা হাস্যকর যুক্তি ইচ্ছে পেতে অসুবিধে হয় না মোহরের। সে যদি কখনও বিয়ে না করে, সন্তানধারণ করার কোনও প্রয়োজন বোধ না করে তাহলে প্রকৃতিরকে অন্যায়সেই উপেক্ষা করতে পারবে।

যোল বছর বয়সেও মেয়ের পোশাকের কোনও পরিবর্তন হয়নি। চালচলনও ছেলের। জুতোতে ধ্যানদার প্রিয় ছাত্র। শান্তি স্যার অনেক বলা সত্ত্বেও সে আখলেট হিসেবে যাঁতে নামতে চায়নি। হেসে বলেছিল, ‘আপনারা তো আমাকে ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াতে দেবেন না।’

শান্তি স্যার বকেছিলেন, ‘সবসময় ওই এক কথা। ছেলেদের সঙ্গে তুই পারবি কখনও? ওয়াশ্চ মিটার রেকর্ড দেখেছিস? পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মেয়ের দৌড়ের রেকর্ড ছেলেদের অনেক পেছনে।’

‘হাত পারে। কিন্তু মেয়েদের ওই সময় ইন্ডিয়ায় কজন ছেলে করতে পারছে? স্টেটফিকে কখনও জিসান আলি হারাতে পারবে টেবিলে?’ ফৌস করে উঠেছিল মোহর।

‘অন্যদের ওপর নির্ভর করে কথা বলিস না। বুঝা যতটা পোলভল্টে ওঠে পৃথিবীর কোনও মেয়ে উঠতে পারেনি এটাই সত্যি।’ শান্তি স্যার বোঝান।

কিন্তু মোহরের ওই এককথা। সে মেয়েদের সঙ্গে দৌড়াতে বা খেলতে চায় না। তাকে অব্যাহ সুযোগ দেওয়া হোক। তাতে হেরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন মিছিমিছি পরিশ্রম করে কি লাভ।

একমাত্র নন্দিনী ছাড়া মোহরের কোনও বান্ধবী নেই। ইতিমধ্যে সে আবিষ্কার করেছে। মেয়েদের সঙ্গে বিশুদ্ধ কথা বলা যায় না। দুচারটে কথাবার পর তারা এমন সব বিষয়ে চলে আসে যাতে বিদ্মুদ্যৎ হুচি নেই তারা। বিষয়গুলো সীমাবদ্ধ থাকে সিনেমা, পুরুষচর্যা আর পোশাক-প্রাসংগে। পুরুষচর্যার সঙ্গে মিশে থাকে অন্য মেয়ে সম্পর্কে নিম্নাশ্রয়। মোহরের মনে হয় বেশির ভাগ মেয়েই মেয়েদের হাফ করতে পারে না, মনে মনে ভরসা করে অথচ সেইসব মেয়ের সামনে পড়লে এমন ভান করে যে তারা কত বন্ধু। এত ক্রত মুখোশ পল্টাটে ছেলেরাও পারে না। অবশ্য ছেলেদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। তারা আড্ডা মার ফিল্টার নিয়ে, খেলাধুলো এবং মেয়েদের শরীর নিয়ে। কোনও ছেলে যদি একটু এগিয়ে যায় তাহলে তারাও হীনমন্যতার ভোগে কিন্তু সেটা প্রকাশে আড়াল আবড়াল খোঁজে না। তাদের কাছে যা সত্যি সেটা তারা গোপন করে না। কিছু মেয়েলি স্বভাবের ছেলেকে বাদ দিলে মোহরের মনে হয়েছে বেশির ভাগই অনেক উদার।

নন্দিনীকে তার আলাদা বলে মনে হয়। নন্দিনী রোগা, ময়লা, চোখে ভারী চশমা আছে। নন্দিনী সুন্দরী নয়। হেসে বলে, ‘কন্যাছেলের নাম পদালাচনও তো অনেকে রাখেন। আমার মা রেখেছিলেন নন্দিনী।’ তিনি ভেবেছিলেন আমি হয়তো রক্তকরবীর মত প্রাণের স্পর্শ আনব। অথচ ল্যামো, আমার না আছে সেই চেহারা, না ক্ষমতা।’

নিজের চেহারা সম্পর্কে যে মেয়ে সচেতন তার বক্তব্য উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু নন্দিনী পড়াশুনায় ভাল। তার টেস্টেও চূড়ান্তর পেয়েছে। মাস্টারমশাইরা ওর সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা রাখেন। মোহর ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?’

‘খারাপ লাগলে কথা বলব কেন?’
‘এটা এড়িয়ে যাওয়া হল। আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারি না।’

‘তোমার মা তো একজন মেয়ে।’
‘ঠিক। মায়ের চেয়ে বাবার সঙ্গে আমার ভাব বেশি।’

‘তোমার মাথায় কিছু একটা ঢুকে আছে আর তুমি সেইভাবে সব ভাবছ। অবশ্য এ নিয়ে চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। যে যা ভাল মনে করে সে তাই করবে।’

‘লোকে যদি বলে আমি যেটা ভাল মনে করছি তা ভুল।’
‘ভুল যদি হয় তাহলে একদিন না একদিন তুমি বুঝতেই পারবে, এখন থেকে তবে লাভ কি?’ নন্দিনী হাসল, ‘জানো, তোমার নামে একজন শিল্পী আছে। তিনি মহিলা।’

‘মোহর নামে মহিলা?’ মোহর অস্বীকার।
‘হ্যাঁ। যা বলছিলেন। তাঁর আসল নাম কলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।’

‘সে কি?’ মোহরকে খুব দিশিষ্ট দেখাচ্ছিল, ‘আমি জানতাম মোহর হল—’

‘এমন একটা শব্দ যার কোনও লিঙ্গ হয় না। শিল্পীও তো তাই। তিনি মহিলা না পুরুষ তা নিয়ে কি আমরা ভাবি? আমরা তার নাম নিজেই গর্বিত।’ নিন্দীনা বলল, ‘পরীক্ষার পরে মায়ে’র সঙ্গে আমি শান্তিনিকেতনে যাব।’

‘ওখানে তো সব মেয়েলি ছেলে থাকে।’

‘কি বাজে কথা। একসময় বাঙালিরা এমন কথা বলে মজা পেত। সেটাই মুখে মুখে চলে এসেছে। বাস্তবে তা নয়। যাক গে, আত্মঘাতী বাঙালি পড়লে?’

‘হ্যাঁ।’ ঠোট মোড়াল মোহর।

‘কি মনে হল?’

‘অনেকটাই সত্যি কথা। সবটা আমি বুঝতে পারিনি।’

‘তুমি এর আগে কখনও একটা প্রবন্ধের বই পুরোটা পড়েছ?’

‘না। কেন?’

‘এই বইটা তো পড়তে পারলে। সেটাই বা কম কথা কি।’

বাড়িতে ফিরে এসে মন খারাপ হয়েই থাকল মোহরের। এতকাল জানত এই পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কোনও মানুষের নাম মোহর নেই। সে একাই নামটার মালিক। অথচ আজ জানা গেল অনেক নামী একজন মহিলার নামও তাই। আচ্ছা উনি মোহর বদ্যোপাধ্যায় হিসেবে রচিত না হয়ে কণিকাকে বেছেছিলেন কেন? মোহর নামটিকে কি তাঁর ভাল লাগেনি? শেষপর্যন্ত মনে হল তার জানার চেয়ে অজানা পৃথিবী বহু বহু গুণে বড়। সেখানে মোহর নামে অনেক অনেক মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু আপাতত তার লক্ষ্য একজন। তিনি দেশবরেণ্য শিল্পী। তাঁকে কি করে অতিক্রম করে যাবে সে এটাই একমাত্র ভাবনার বিষয়।

পরীক্ষার আগে ধ্যানন্দা নিজে থেকেই ছুটি দিয়েছিলেন। মাসপানের আঠারো ঘণ্টা বই মুখে নিয়ে পড়েছিল মোহর। অন্নদা মুখার্জি তাঁকে মাঝেমাঝেই একটু ঘুরে আসতে বলতেন। কিন্তু সেটা না করে কবিতার বই পড়ত মোহর কিছুক্ষণ। অন্নদা মুখার্জির সাহিত্যে প্রীতি আছে। নানান প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও কবিতাকে দাড়িয়ে গিয়েছিল। হলদপুর থেকেও যে সেগুলো তিনি পেয়েছেন তা দেখে নন্দিনীও অবাক। পুরনো মাসিক বসুমতী থেকে অনুদীপ পত্রিকা কিছুইই অভাব নেই। নন্দিনীর উৎসাহে মোহর জীবনানন্দ দাস পড়েছে। পড়ে মনে হত ভুলোক পৃথিবীর অল্পত অল্পত সৌন্দর্য আশ্চর্য করে তার মধ্যে নিজস্ব হওয়া বুন দিয়েছেন। মরিচ শব্দটির ব্যবহার সে এই বয়সেই করতে শিখল। নন্দিনীকে সে কথা বলতে মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল, ‘জীবনানন্দের কবিতা পড়ে তোমার কি মনে হয় বল তো?’

‘আমি বলতে পারি কিন্তু তোমার শুনতে খারাপ লাগবে?’

‘ওঁর কবিতা তোমার ভাল লাগেনি?’

‘মোটেনি না। পড়লে নেশা হয়ে যায়।’

‘তাহলে?’

‘আমার মনে হয়েছে কবিতার লাইনে লাইনে একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন কবি এবং সেখানে বসে নিজেই রক্তাক্ত করেছেন। এই রক্তাক্ত হওয়াতে তিনি মোটেই দুর্গবিত হননি বরং নিজস্ব রক্তঝরা চেহারা দেখে বুশিই হয়েছেন।’ গোলাবুলি বলে ফেলল মোহর।

ওর দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল নন্দিনী। তারপর নিচু গলায় বলল, ‘আচ্ছা, তুমি লেখ না কেন?’

‘আমি?’ চিংকার করে হেসে ফেলল মোহর, ‘পাগল।’

‘ভবে ম্যাথো। লেখা এমন একটা মাধ্যম যা শুধু মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকতে স্ক্রেট তোমাকে বাধ্য করবে না। এখন লেখিকা বলে কোনও শব্দ নেই।’

লেখিকা বলে কোনও শব্দ নেই? হকচকিয়ে গেল মোহর। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশেতা দেবী লেখিকা না সাহিত্যিক? বুকের মধ্যে অল্পতভাবে ইচ্ছেটা জন্মে গেল। আমি কি লিখতে পারব? তারপরেই মনে হল কি লিখব? কিভাবে লিখব? ভাবতে যা ভাল লাগে তা কি ভুবু লেখা যায়? কোনও একটা গল্প অথবা উপন্যাস পড়লে মনে হয় সেটা লেখা হয়েছে নিশ্চয়ই কিছু নিয়মানুসারে মেনে। মোহরের মনে হল সেইসব নিয়ম তা তার জানা নেই। সে যা ইচ্ছে লিখলে লোকে পড়বে কেন? একজন মানুষ তার মনের মত লেখা লিখে যেতে পারেন কিন্তু তার যদি কোণ পাঠক না থাকে তবে তিনি কি লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন?

পরীক্ষাটা হয়ে গেল। অন্নদা মুখার্জি বলেন, ‘ক্রিকেট খেলায় কিছু খেলোয়াড় প্রায় প্রতিটি ম্যাচে ব্যট সন্তর সাবলীলভাবে করে আউট দিয়ে যায়। সেগুলি করতে খুব দেখা যায় তাদের? তোর অবস্থা ঠিক তাই। ইচ্ছে করলে নম্বর বাড়তে পারিস কিন্তু ইচ্ছেটাই করবি না।’

ফাইনাল পরীক্ষায় সেই ইচ্ছেটা এসেছিল কিন্তু শেষমুহুর্তে নন্দিনীর কথায় লেখক হবার চিন্তা ঢুক বাওয়ায় মন গোলমাল পাকাল। তবে রেজাল্ট ভাল হবেই এবং অন্নদা মুখার্জি চান মেয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে যাক। জেলাশহরে কলেজ আছে কিন্তু ঝরত ঝরন একই হবে তখন ওর কলকাতায় যাওয়াই ভাল। নন্দিনীর মায়ে’রও সেইরকম বাসনা। নন্দিনীকে অন্নদা মুখার্জি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?’

নন্দিনী চটপট জবাব দিয়েছিল, ‘স্বাভাব্য হওয়া। একটু ভালভাবে।’

‘কিভাবে হবে?’

জয়েন্ট দেব। যদি ডাক্তারি পাই তাই পড়ব। এদেশে আর যাই হোক ডাক্তাররা বেকার থাকে না।’

মোহরের মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তোমার মা যিহের কথা ভাবছেন না?’

‘পাগল। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে ওসব কথা উঠবেই না।’ নন্দিনী হেসেছিল, ‘তাছাড়া আমার যা চেহারা তাতে টাকাপয়সা না দিলে কেউ বিয়ে করবে না। এবং তারপর তো সারাজীবন যিনি’র করতে হবে।’

‘ওকিবা বলছ কেন? দেখতে ব্যাটা ভাল নয় তাদের কি বিয়ে হয় না?’

নন্দিনী বলেছিল, ‘হেলের বিয়ের সময় সব বাবা মা চায় সুন্দরী বউ আসুক। আমার ভাই থাকলে আমিও চাইতাম। যাদের হয় তাদের তো মাথা নিচু করে শব্দরবাড়িতে ঢুকতে হয়। তারপর স্বামী যদি মারা যায় তখন অন্যের গলগহ হয়ে থাকে। এখন দিনকাল বদলে যাচ্ছে। আপনারা হয়ই হাতবিরোধ হোক ছাড়াছাড়ির কথা ভাবতে পারেন না। অভ্যেসে একসঙ্গে থেকে যাচ্ছেন। আমাদের সময় সেটা তো নাও হতে পারে। আর্থিক নিরাপত্তা না থাকলে তেমন হলে চলবে কি করে?’ খুব শান্তমুখে কথাগুলো বলেছিল নন্দিনী।

মোহরের মা জবাব দিতে পারেন নি। তাঁর শুধু মনে হয়েছিল এই ছোটখাটো রোগা কালো মেয়েটা মোহরের থেকে কম যায় না। শুধু দুজনের প্রকাশের পদ্ধতিটা আলাদা।

পরীক্ষার পর অহুসার অবসর। সকাল থেকেই বই নিয়ে বসে যায় মোহর। পরপর সিঁড়ি ভেঙে পড়া নয়, বন্ধিমের পর সমরেশ বসু পড়তে কোনও দ্বিধা নেই। গোপাংসে পড়ে গেলে যতটা জানা যাবে ততটাই যেন লাভ। বিকেলবেলায় সে এখনও ধ্যানদার কাছে যায়। যদিও সে টের পাচ্ছে

জুড়োর আকর্ষণ তেমনভাবে নেই। নেহাতই অনেক বছর আগে ধ্যানদাকে কথা দিয়েছিল বলেই এখনও যাওয়া। মোহরের ওজন এখন বাষাটি, ল'শায় পাঁচ ফুট পাঁচ। শরীরে মেদ নেই বলে বেতের মত ছিপছিপে দেখায়। অখ্য মজার্টা এমনই হলুদপুরের কোনও পরিচিত মুখও ওর দিকে তাকায় না, বিরক্ত করা দূরের কথা।

বিলক্বেলোয় ধ্যানদা একটা খবর দিলেন। কলকাতায় সারা বাংলা জুড়ে হচ্ছে। সংগঠকরা ধ্যানদার পরিচিত। তিনি উপেন আর মোহরের নাম পাঠিয়েছেন সেখানে। মোহর যেন বাড়িতে কথা বলে অনুমতি নেয়। দিন চারেকের জন্যে কলকাতায় যেতে হবে। প্রস্তুতটা শোনামার লাক্ষিয়ে উঠেছিল মোহর। বই পড়তে পড়তে কলকাতা তাকে এখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে কলকাতার অনেক রাস্তার বিবরণ ঠিকঠাক দিতে পারে। সেই কলকাতায় পৌছানোর জন্যে পরিষ্কার ফল বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না এটা তো বিরাট গাওয়া।

মাত্র ভিত্তি দিয়ে হলুদবিলের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল মোহর। অঙ্ককার না নামলে এই পথটায় অনেক কণ সময় লাগে। এইসময় মোটার বাইকের গাওয়াধা কানে এল। সে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখতে পেল প্রাণেশকে। কয়েক বছর আগের সেই ঘটনার পর সে প্রাণেশকে খুব কমই দেখতে পেরেছে। ধ্যানদার ওখানে আর কখনও যায়নি প্রাণেশ। বড়লোকের ছেলে প্রাণেশ নাকি এখন আদৌ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে না এমন কানায়ুসা আছে। তবু প্রাণেশের কথা মনে এলে কি রকম অবশিষ্ট হয়। স্টোকে নিজেই বুঝতে পারে না মোহর।

প্রায় গায়ের পাশ দিয়ে বাইকটাকে এমনভাবে নিয়ে এল প্রাণেশ যে লাক্ষিয়ে সরে দাঁড়াল মোহর। প্রাণেশের চেহারা আর একটু জৌলুস এসেছে, একটু মোটাও হয়েছে। চোখে রঙিন চশমা। বাইকে বসেই প্রাণেশ বলল, 'কিরে? চিনতে পারছিস?'

'তুই কি করে ভাবলি আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ?'

'আই বল। আমাকে তুই বলছে। সাহস তো কম না!' প্রাণেশ বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল। চোখ থেকে রঙিন চশমা খুলল, 'বড় হয়েছিস না বেড়ে গিয়েছিস?'

'তুই যদি আমাকে তুই বলতে পারিস তাহলে আমি কেন পারব না?'

'অন্য কেউ হলে মেরে মুখ ফাটিয়ে দিতাম—' চীচিয়ে উঠল প্রাণেশ।

'চেষ্টা করে দ্যাখ।' পা ফাঁক করে দাঁড়াল মোহর।

'ওই শালা ধ্যান যা শিখিয়েছে তার কিছুই কাজে লাগবে নারে।' চুক চুক শব্দ করল প্রাণেশ,

'তোরা ফিগারটা মাইরি বেশ খাবো খাবো হোয়ে।'

'থেকে দ্যাখ, হজম করতে পারলে বুঝব তোরা বাপ মা ছিল।'

'কি বললি?' চিৎকার করে ছুটে গেল প্রাণেশ। তৈরি ছিল মোহর। একটা বড় ভারী শরীরকে কিভাবে আছড়ে ফেলতে হয় সেটা তার জানা। প্রাণেশ এতটা আশা করেনি। সে ডেবেছিল মোহরের জুড়ো শেখা নেহাতই শৌখিনতা ছাড়া কিছু না। কয়েক বছর আগে উপেনের কাছে মোহর বেরকম আছাড় খেয়েছিল তার স্মৃতিটিই সে ধরে রেখেছিল। নিজে চটায় থাকেনি তাই পরিস্থিতি যখন শরীরকে জাগাতে চাইছে তখন শরীর সাড়া দিচ্ছে না। মোহরের শরীর চাবুকের ক্ষিত্রাতয় বিভিন্ন ভঙ্গি নিয়ে আঘাত করছিল প্রাণেশকে। প্রাণেশ উপুড় হয়ে পড়তে গেল।

জায়গাটা নির্জন তখনও মারপিটের আড্ডা পাওয়ায় কিছু মানুষ ছুটে এসে সর্বি'স'য়ে দৃশ্যটি দেখাছিল। মোহর হলেন প্রাণেশের জখম হওয়া হাতটা চেপে ধরেছে, 'তোরা এই হাত একসময় ভেঙেছিল, মনে আছে? আবার ভেঙে দেব?'

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণেশ বলল, 'তুই যা জিনিস সব পারিস।'

'জিনিস? আমি কি মাল? হাতে চাপ বাড়াল মোহর।

'উঃ। বাপস। আমি প্রশংসা করলাম আর তুই খারাপভাবে নিচ্ছিস।'

'জিনিস বলা কি প্রশংসা করা?'

'নিশ্চয়ই। তুই অন্য পাবলিককে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ।'

'তোকে আজ আমি ছেড়ে দিলাম।'

'কেন? ছাড়ার কি দরকার? হাত ভেঙে দে।' উপুড় হয়েই বলল প্রাণেশ।

'নাঃ।' হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মোহর।

'পেড়ি চলে যাওয়ার সময় গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে যায়। তুই সেরকম করলেই পারতিস।'

ধীরে ধীরে বলল প্রাণেশ।

'তুই আমাকে পেড়ি বললি? তুই নিজে কি?'

'পেড়িকু আর কি বলব? শালা মায়ের কি জোর।'

'অন্য কেউ হলে সত্যি সত্যি হাড় ভেঙে দিতাম, তুই বলে ছেড়ে দিলাম।'

'অন্য কেউ হলে আমি চেনাবার খালি করে দিতাম—' কোমরের ভেতরে আলাদা ব্যবস্থা করে রাখা রিতলবার বের করে দেখাল প্রাণেশ।

'তুই এসব রাখিস নাকি সঙ্গে?' বেশ ঘাবড়ে গেল মোহর।

'রাখতে হয়। আজকাল গায়ের জোর অথবা জুড়োর কায়দায় কোনও লাভ হয় না। চেনবার থাকলে তুই শের, নইলে ভাগ্যে চলে যাবি।'

'তুই এসব কথা শিখলি কি করে? হলুদপুরে কেউ বলে না।'

'হলুদপুরে সবাই তাই আমাকে চমকায়ে।' উঠে দাঁড়াল প্রাণেশ।

'রিভলবারটা দেখি।' হাত বাড়াল মোহর।

'কি করবি?'

'দেখো। আমি কখনও রিভলবার হাতে নিইনি।'

'ফোটা। দেখতে হবে না। বহুত স্বতরনাক জিনিস।' ওটা যথাস্থানে রেখে দিল প্রাণেশ, 'তুই কি এখনও ধ্যানদার কাছে যাস? যাস বলেই মনে হল। তাই না?'

'হ্যাঁ। তুই কি করিস?'

'মাল কামাই। মাল না থাকলে কেউ পাতা দেবে না। যাকগে, তুই আমাকে এত প্যাঁদালি অখ্য আমি কিছুই বললাম না, এটা তো হতে পারে না। আয় তোকে একটা চুমু খাই।'

'ভাগ। তোকে চুমু খাব কেন?'' ছিটকে সরে গেল মোহর।

'আরে তুই খাবি কেন, আমি খাব বলেছি।'

'ওসব আমার কাছে হবে না?'

'এহা তুই তো আবার মেয়েলোকে নস। ঠিক হয়। বাইকে ওঠ, পৌছে দিয়ে যাচ্ছি।' প্রাণেশের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে মেয়েলোকে শব্দটির জন্যে এখন আর কথা বাড়াল না মোহর। হুপচাপ খানিকটা দূরত্ব রেখে বাইকের পেছনে চেপে বসল। যারা দৃশ্যটি দেখতে এসেছিল তারা ভেবে পাচ্ছিল না পরিণতি এরকম হল কি করে? একটা লাল পড়ো যাওয়াই তো একজেরে স্বাভাবিক ছিল।

রক্তমাংস সঙ্গে আর কখনওই মোকাবিলা করা হয়নি। অনেকগুলো বছর পরেও মাঝে মাঝে মোহরের মনে ওর কথা আসে। কি চমৎকার ভালবাসতে পারত রক্তমাংস। মনের কোথাও ঝাঁক থাকত না। বোধহয় ওই কারণেই বোচায়ার পড়াশুনাটা ভাল এগোচ্ছিল না। মাঝখানের একটা ক্লাসে দু বছর থাকতে হয়েছে। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সেই সঙ্কের পর রক্তমাংস যেন তাকে চিনতেও পারে না আর সময় বয়ে যাওয়ায় তারও ওর সম্পর্কে আকর্ষণ কমে গিয়েছে। এই আকর্ষণ কমে যাওয়ায় পেছনে কিছু গম্প হয়তো কাজ করেছে। সবাই জানে রক্তমাংস একই সঙ্গে অন্তত দুজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে। একটু দেখতে ভাল এমন কোনও পুরুষ হলুদপুরে নেই যে ওর

প্রেমপর পায়নি। এমন পুরুষপ্রেমিক যে কেন তাকে প্রেমের জন্যে বেছে নিয়েছিল তা বুঝতে পারেন না সে।

কলকাতায় জুড়োর জন্য যাওয়ার অনুমতি দিতে অম্মদা মুখার্জি আপত্তি করেন নি। মেয়ের যে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে এটা তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যোহেতু মহিলা তাই তাঁর পক্ষে একে একা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া জুড়ো এমন একটা বেলনা যে অশুষ্টি থাকেই। আহত হলে কে দেখবে সেখানে যতই ধ্যানদা সঙ্গে থাকুক। শেফরখণ্ড ঠিক হল অম্মদা মুখার্জি নিজের খরচে মেয়ের সঙ্গে যাবেন।

পরদিন ধ্যানদাকে ঘটনাটা বলতে তিনি মাথা নাড়লেন, 'বেশ তো, উনিও চলুন।'
শুধু উপেন ঠোট টিপে হাসল। হাসিটাকে ভাল বলে মনে না হওয়ায় মোহর কারণ জিজ্ঞাসা করল। উপেন বলল, 'আমার সঙ্গে তো কেউ যাচ্ছে না। যাবে না কারণ আমি শিশু নই যে অন্যের সাহায্য দরকার হবে। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে কেন?'

ধ্যানদা বললেন, 'ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছে কেন?'
উপেন বলল, 'তাহলে বড় বড় কথা বলা বন্ধ করতে বলুন।' বলে সরে গেল সেখান থেকে।
মাথা নিচু করে বসে ছিল মোহর। ও যে নিছক একটি মেয়ে এবং তাই অতিভাবক ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয় এটা এখন প্রমাণিত। অন্তত বাবার সঙ্গে যাওয়াটাই তাই প্রমাণ করবে। একবার মনে হল সে ধ্যানদাকে বলে দেবে যে কলকাতায় যাবে না। কিন্তু সেটা বলার মত সাহস সে পাচ্ছিল না।

সেই রাতে মোহর অম্মদা মুখার্জিকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে যাচ্ছে?'
অম্মদা মুখার্জি মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তুই একা থাকবি, কেনও কিছু যদি দরকার হয়—'
'তার জন্য তো দলের ম্যানেজার হয়ে ধ্যানদাই যাচ্ছেন।' মোহর ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'উপেন তো একাই যাচ্ছে। ওর যদি বাবার প্রয়োজন না হয় তাহলে আমার হবে কেন?'

'ঠিকই। তবে আমি ভেবেছিলাম প্রতিযোগিতা হয়ে গেলে তোদের দল যখন চলে আসবে তখন তোকে নিয়ে আমি একটু ঘুরে বেড়াব। কলকাতার খবর নিতে হবে।'

'তাহলে মাকে নিয়ে প্রতিযোগিতা যেদিন শেষ হবে সেদিন এসো।'

'তোমার মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলি—'

'মোহর নামে যদি তোমার কোনও ছেলে থাকত তাহলে একথা বলতে?'

'যদি বলি বলতাম তাহলে মানতে চাইবি না। ঠিক আছে, গো অ্যাডভেজ।'

ধ্যানদার কাছে কলকাতায় যাওয়ার আগের দিন হঠাৎই প্রাণেশ এসে হাজির। ধ্যানদা একটু অবাকই হয়েছিলেন, 'কি ব্যাপার প্রাণেশ, তুমি?'

'শুনলাম আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন কম্পিউশনে?'

'হ্যাঁ। ছেলেরা তো যাকেমানে অভিজ্ঞতা পাওয়া দরকার।'

'ভাল। বলুন আমি কি করতে পারি?'

'তুমি কি করবে?'

'ধ্যানদা, একসময় আমি আপনার কাছে শিখেছি। অ্যাকসিডেন্ট না হলে আমি দূরে সরে যেতাম না। কিন্তু আমার সবসময় আপনারদের কথা মনে আসে। তাই দল নিয়ে যখন কলকাতায় যাচ্ছেন তখন আমি কিছু উপকারে লাগতে চাই। সবাই যাতে ওখানে ভালভাবে থাকতে পারে সেটা আমি দেখব। কত দিতে হবে বলুন।' প্রাণেশ বলল।

'তুমি টাকা দিতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু প্রাণেশ, এখন তো টাকার দরকার হবে না। যাযাতায়েত টিকিট হয়ে গেছে। আমরা থাকব উদ্যোক্তাদের বাসস্থানায়। ওরাই খাবার দেবে। কোনও খরচই হবে না। তুমি যে নিজে থেকে এগিয়ে এসেছ এটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'ওখানে যেসব খাবার পাবেন তা বারোয়ারি খাবার। একটু স্পেশ্যাল করতে চাইলেই টাকা দরকার হবে।'

ধ্যানদা বললেন, 'দ্যাখো, উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই জানেন প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে মিনিমাম কি খরচের খাবার দরকার হবে। সেটা বারোয়ারি হবে আপত্তি কি। ধরো হলুদপুরের ফুটবল দলকে আই এফ এ শিল্ড খেলতে নিয়ে গিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের যদি লাঠি তাহলে ওরা কি সেমিফাইনালেও উঠতে পারবে? তবু তুমি বলছ বলে আমি খুশি।'

প্রাণেশকে ধ্যানদার সঙ্গে কথা বলতে দেখছিল মোহর। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল ওদের মধ্যে যদিও কোনও কণ্ঠস্বারাচ্ছ হচ্ছে না কিন্তু ধ্যানদা বোধহয় কোনও কিছুতে রাজি হচ্ছেন না। প্রাণেশ উঠে দাঁড়াল। উপেনকে কিছু বলল। তারপর মোহরের দিকে এগিয়ে এল, 'জিততে হবে কিন্তু। পাবলিক যেন হলুদপুরের নাম জানতে পারে।'

মোহর হাসল, 'চেষ্টা করব।'

'তাহলেই হবে।' হঠাৎ গলা নামাল প্রাণেশ, 'আমি নিজের রাস্তায় অপেক্ষা করছি।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল।

ওকে চলে যেতে দেখল মোহর। আর সেইসঙ্গে আবিষ্কার করল প্রাণেশ সম্পর্কে তার মনে একসময় যে আকর্ষণটা উকি মারত সেটা এখন প্রবল হচ্ছে। প্রাণেশ মানেই এক রুক্ষ বন্য ব্যাপার। জীবনানন্দ দাস বা সাহিত্যশিল্পের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই। উপেন এসে বলল, 'প্রাণেশ টাকা দিতে এসেছিল।'

'কিসের টাকা?'

'আমাদের কলকাতার খরচ। ধ্যানদা নেয়নি।'

'ওর অনেক টাকা আছে, না?'

'থাকবে না। দুশুন্সরি কারবার করে দিনরাত। মদ খায় খুব।'

মিনিট তিরিশেক বাদে মোহর প্রশ্নটা করল নির্জন পথে দাঁড়িয়ে, 'তুই মদ খাস?'

একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে প্রাণেশ হাসল, 'খাই।'

'কেমন খেতে রে?'

এবার যেন ফাঁপরে পড়ল প্রাণেশ। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। তবে প্রথম কয়েক চুমুক ভাল লাগে না তারপর জমে যায়।'

'জমে যায় মানে?'

'মেজাজ খুলে যায় তখন খেতে খুব ভাল লাগে। তবে যেই বুকি আমার নেশা হয়ে যাচ্ছে তখনই খাওয়া বন্ধ করি। নো মোর।'

'কেন? মদ তো লোকে নেশা করার জন্যেই খায়।'

'তারা বোকা। নেশা হয়ে গেলে নিজের ওপর কন্ট্রোল থাকবে না। তখন যে যা খুশি করবে আমাকে নিয়ে। সেটা হতে দিচ্ছি না।'

অবিশ্বাসী চোখে তাকাল মোহর, 'দ্যাত। এরকমভাবে নিজেকে সামলানা যায় নাকি?'

'একশোবার যায়। আমি কি পারি তা তুই জানিস না। খারাপ মেয়েদের পাড়ায় কতবার ফুটি করতে গিয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের দুইয়ে দেখিনি।'

'তুই খারাপ মেয়েদের কাছে যাস?'

‘যাই। ওরা কোনও ভ্যানতারা করে না। সব খোলামেলা কিন্তু ওরাও জানে আমি অন্য কোনও ধন্দায় নেই। গান শুনব, মদ খাব, নাচ দেখব, ব্যাস।’

‘আমাকে একদিন নিয়ে যাবি?’

‘হকচকিয়ে গেল প্রাণেশ, ‘তুই যাবি?’

‘তুই যা যা করিস তা আমি করতে পারি, শুধু মদ খাব না।’

‘কিন্তু মেয়েছেলারা ওখানে যায় না।’

‘আমি মেয়েছেলে নই।’

‘ও হ্যাঁ। সরি। কিন্তু দিনের বেলায় ওখানে কেউ যায় না। তাছাড়া রানীগঞ্জে যেতে আমার হাইসেও একমুঠার বেশি লাগবে।’ প্রাণেশ বিধায় পড়ছিল।

‘ঠিক আছে। কলকাতা থেকে ফিরে আসি তারপর একটা রাস্তা ভাবব। আচ্ছা, তোর নাকি দুশ্চরিত্র কারবার কবে অনেক টাকা হয়েছে?’

‘কোন শালা বলল?’

‘হ্যাঁ কি না তাই বল?’

টাকা আসে কিন্তু থাকে না; উড়ে যায়। কাগজগুলোর গায়ে ঘেন ডানা লাগানো থাকে। এই দ্যাখ না, গত সপ্তাহেই হাজার দশেক কামাল। ভাবলাম ব্যাংকে ফিস্তি করে দেব। শালা পরদিনই খবর পেলাম মাসির ছেলটার একটা বড় অপারেশন হবে। অবশ্য ওদের খারাপ তাই টকটাকা পাঠিয়ে দিলাম।’

‘যাক ভাল কাজে লাগল টকটাকা।’

‘তাতে আমার কি উপকার হল।’

‘তুই আমাকে ডাকলি কেন?’

‘চলে যাবি তাই কথা বলতে হচ্ছে হল।’

‘সে কি? তোর সঙ্গে তো আমার কত বছর যোগাযোগ নেই। আর আগে তো তুই আমাকে মানুষ বলেই ভাবতিস না। তাহলে—?’

‘কি জানি। সব শালা উল্টো হয়ে যাচ্ছে। চল, বাইকে ওঠ, পৌছে দিচ্ছি।’

মোহর উঠল। পেছনে বসে বলল, ‘তুই যে দুশ্চরিত্র করিস, পুলিশ যদি ধরে?’

‘ধরবে না। পাটি পেছনে না লাগলে পুলিশ ধরবে না। পাটি রেগুলার মাল খায় আমার কাছ থেকে। নইলে পারলিক এত খাতির করত না আমাকে।’ পিপিড বাড়াল প্রাণেশ।

বাড়ির কাছাকাছি বাইক থামাল প্রাণেশ, ‘তোরা ফাদার আসছে।’

বাকের দেখে বাইক থেকে নেমে পড়ল মোহর, ‘ঠিক আছে।’

‘কটল্যাম। আবার পিপিড তুলল প্রাণেশ।

অমলা মুখার্জি সবিস্ময়ে সেইদিকে তাকিয়ে থাকলেন। মোহর তাঁর পাশে এল। তিনি মেয়ের মূর্খের দিকে তাকালেন, ‘এর নাম প্রাণেশ না?’

‘হ্যাঁ। মোহর বাবার পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারছিল না।

‘এর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?’ অমলা মুখার্জির কণ্ঠস্বর বেশ দুর্বল।

‘অনেক দিন আগে আলাপ হয়েছিল।’

অজুত। তুমি জানো ও দুদবার ফেল করার পর পড়াশুনা ছেড়েছে? হলদপুরের মানুষ ওকে শুণ্ডা বদমাশ বলে। শুনতে পাই ইলিজিয়াল উপায়ে টাকা রোজগার করে।’

‘তাহলে পুলিশ ওকে ধরছে না কেন?’

‘হ্যাঁ। ও। তুমি বুঝবে না কেন পুলিশ ওকে ধরছে না। কিন্তু ও একটি কালপ্রিট ছাড়া কিছু নয় আর তুমি ওর বাইকে চড়ছ?’

‘বাবা। ও কি করে আমি জানি না, তবে আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করে। আজ ধ্যানদার কাছে গিয়েছিল আমাদের কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে। ধ্যানদা নেননি। আর কেউ তো যাবনি।’

‘মোহর। চার্লস শোভরাজ নামে একটি বুনির নাম তুমি শুনেছ। তাকে বুন করতে চোখে দ্যাখোনি। এই মুক্তিতে কি তুমি শোভরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?’

‘ও। কিন্তু বাবা প্রাণেশ আমার বন্ধু না।’

‘তাহলে?’

‘শুধুই পরিচিত।’

অমলা মুখার্জি হাঁটতে আরম্ভ করলেন, ‘শ্যামো, লোকে কি বলবে এই নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। তোমার ক্ষেত্রে আমার স্তান্ড কি তা তুমি জানো। বাইরের মানুষ দুইয়ের কথা তোমার মায়ের আপত্তি আমি শুনি। তবে আমি এমন কাজ কখনও করব না যাতে আমার প্রিয়জন কষ্ট পায়। তুমি করবে কিনা তা ভেবে দেখো।’

ভেবেছিল মোহর। প্রাণেশকে তার বন্ধু বলে ভাবতে হচ্ছে করে না। ওর পড়াশুনা নেই, কথাবার্তা যে ঘরানায় বলে তাতে বেশিক্ষণ কথা চালানো যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রাণেশের কথা স্বভাবের জন্যে সে অজুত আকর্ষণ বোধ করে। এই আকর্ষণের কথা কাউকে সে ব্যক্তিরে বলতে পারবে না। প্রাণেশকে দেখার জন্যে, কথা বলার জন্যে তার মন কখনওই উন্মুখ হয় না। কিন্তু প্রাণেশকে চোখে দেখলে তার কিছুমাত্র খারাপ লাগে না। এখন মনে হচ্ছে তার একটা বাইক থাকলে ভাল হত।

প্রতিযোগিতায় এসে ঝামেলায় পড়লেন ধ্যানদা। তিনি নাম পাঠিয়েছিলেন এবং তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের কোনও সন্দেহ হয়নি। দল নিয়ে আসার পর যখন তারা জানল মোহর মুখার্জি একটি মেয়ের নাম তখন তারা আপত্তি করতে লাগল। যেহেতু একটা করে মেয়েরের শাখায় প্রতিযোগিতা হচ্ছে না তাই মোহরকে বাউলি করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

ধ্যানদা তাঁর প্রতিবাদ করলেন। সার্কুলার দেখিয়ে বললেন কোথাও লেখা নেই যে প্রতিযোগিতা শুধু ছেলদের জন্যে, মেয়েরা যোগ দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত মোহরকে মেয়ে হিসেবে গণ্য না করে প্রতিযোগী হিসেবেই দেখা উচিত যখন তার নামের এট্রি ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গেছে। অনেক আলোচনা এবং বিতর্কের পর মোহরকে অনুমতি দেওয়া হল। ধ্যানদা খবরটা দিয়েই মোহর তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তার মনে ছিল ফুটবল এবং জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলোর মত তাকেও এখান থেকে বিফল হয়ে ফিরতে হবে। সেটা যে হল না তা কেবল ধ্যানদার জন্যেই। প্রতিযোগিতায় নাম্বার আগেই যেন সে জিতে গেল।

শহর কলকাতায় পা দিয়ে থমকে গিয়েছিল মোহর। প্রথমেই একটা অজুত চিন্তা মাথায় ঢুকছিল। এই যে এত মানুষ পিলপিল করে ছুটে যাচ্ছে তাদের নিশ্চয়ই একটা করে বাপিল এবং বিছানা আছে নইলে রাস্তে তারা ঘুমায় কি করে? তাহলে কলকাতায় কত বাপিল বিছানার প্রয়োজন হয়? এত ধোঁয়া এত বিশৃঙ্খলতায় এখানকার মানুষ কি করে দিন কাটায়? কলেজে পড়তে তাকে এখানেই আসতে হবে। বাংলা সাহিত্যের যেসব গল্প উপন্যাসে তার কলকাতা সম্পর্কে জান লাভ হয়েছে তাদের কোথাও শহরটার এই অসহ্য চরিত্রের কথা বলা হয়নি। বাসে উঠলেই বাধা যায় এখানকার মানুষ কি রকম নিশ্চয়। এই মোহরভক্তের জন্যে মোহর খুব কষ্ট পাচ্ছিল।

উদ্যোক্তারা তাদের রেখেছিল একটা হোস্টেলে। তিনজনের জন্যে একটাই ঘর। ভাণ্ডা ভাল বাথরুমটা লাগেয়া। ধ্যানদা আর একটা ঘরের চেষ্টা করতে মোহর বলেছিল, ‘আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি বাথরুমে জামাপ্যাঁজি তৈজ করে নেব।’

ধ্যানদা উপনের দিকে তাকালেন। উপন কোনও কথা বলেনি।

প্রথম রাউন্ডে নেমেই মোহর বুঝল দশকর্মা তাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। সে ছেলে না মেয়ে এই ধন্দে পড়ে গেছে অনেকের। পোশাক এবং চুল কোনও ছেলের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। কলকাতায় আসার সময় আর একপ্রস্ত চুল ছেঁটে নিয়েছিল সে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেও শরীরের আদল সর্বত্র বদল করতে সক্ষম হয়নি সে। দশকর্মের কথা ভেবেই সে সপ্রতিভ হল। প্রতিপক্ষ তাকে বুঝে ওঠার আগেই সে হাল ধরে ফেলল। তার প্রতিটি শিরায় যেন খবর চলে গেল জিততে হবে। এবং এত দ্রুত যে তাকে জয়ী ঘোষণা করা হবে সে নিজেও কল্পনা করেনি। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার হাসি নিয়ে ধ্যানদার সামনে আসতেই প্রচণ্ড ধমক বের মোহর, 'অত ছোট্ট করছিবে কেন? কাকে কি দেখাচ্ছিলে। মন কিক রাখে।'

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি মোহরের। তুলনায় প্রথম রাউন্ডে বেশ হিমসিম খেয়েছিল উপেন। জিততেছিল বেশ কষ্ট করে। ইতিমধ্যে চড়ির হয়ে গিয়েছে জুজো প্রতিযোগিতায় ছেলদের সঙ্গে সমানে পাড়া দিয়ে জিতবে একটী মেয়ে। তৃতীয় রাউন্ডের শেষে খবরের কাগজের রিপোর্টার এল। ধ্যানদার অনুমতি নিয়ে মোহর তাঁদের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'আমি যা কিছু শিখেছি তা ধ্যানদারই শেখানো।'

'একজন মহিলা হয়ে আপনি অদ্ভুত কাণ্ড করছেন বলে মনে করেন না?'

'না। একজন মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক কাজই করছি।'

'কিন্তু মহিলাদের শরীরের গঠন তো ছেলদের মতন নয়।'

'ঠিকই। কিন্তু যা আছে তাই নিয়েই তো বাচেনি পাল এভারেস্টে ওঠেন।'

'আপনার লক্ষ্য কি?'

'আমি মানুষ সঁটা প্রমাণ করা।'

পরদিন মোহর হেরে গেল। এবারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অনেক অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। হেরে গেলেও তার লড়াই করার ধরন অনেকের ভাল লাগল। উপেনও হারল তবে কোয়ার্টার ফহিনালে। কিন্তু দলের এই পারফরমেন্সে ধ্যানদা অখুশি নন। বললেন, 'প্রথমবার এখানে এসে তোমরা যা করেছ তা যথেষ্ট। এই যে অভিজ্ঞতা হল তা পরের বার কাজে লাগাও।'

মোহর কিছু বলেনি। সে এখন অনুভব করছিল একটা অসম লড়াইয়ে ঢুকে গিয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষের পক্ষে একটা বড় পর্যন্ত সম্ভব। সেই ভরে সে পৌঁছে গিয়েছে যা তাকে তৃতীয় রাউন্ডে এনে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে শরীরের কোনও ভূমিকা নেই, প্রকৃত যেখানে নিষ্ক্রিয় সেখানে সে যে কোনও পুরুষকে অন্যায়সেই চ্যালেঞ্জ করবে। তারই হালদপুরের কবির গিয়ে মোহর একদিন ডায়ালগর সামনে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বল।' ধ্যানদার কপালে ভাজ পড়ল।

'আমি যদি আর কোনও প্রতিযোগিতায় না নামি তাহলে আপনি রাগ করেন?'

একটু ভেবে হেসে ফেললেন ধ্যানদা, 'হ্যাঁ, এই প্রশ্ন?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি এসব করছি আপনাকে কথা দিয়েছি বলে।'

'বেশ তো। তোর ভাল লাগলে আমি ক্ষোর করব না।'

'আপনি জিজ্ঞাসা করছেন না কেন আমার ভাল লাগছে না?'

'ইচ্ছে হলে বলতে পারিস।'

'তৃতীয় রাউন্ডে লড়াইয়ের আগে আমি অসুবিধায় পড়েছিলাম। প্রকৃতি মেয়েদের যে শাশি দেয় আমার তখন সঁটা শুরু হয়েছিল অথচ আমার প্রতিপক্ষ পুরুষ বলে তার কোনও দৈহিক অসুবিধা হয়নি। ইটচালা বা অনুশীলনে আমি ওই ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু রিভে নেমে আমার মনের ওপর চাপ পড়ছিল। তার ফলে একটা অসুবিধে নিজেই তৈরি করে ফেলেছিলাম।'

'কথাটা তখন আমাকে বলসনি কেন?'

'বললে কি হত? আমার শরীরিক অসুস্থতার কথা বললে সবাই হাসাহাসি করত। আরও অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাত। ওরা নিশ্চয়ই চার দিন প্রতিযোগিতা বন্ধ করে রাখত না। আর যেনে বলে সঁটা করলে তাই নিয়ে মশকরা শুরু হয়ে যেত।'

'তা হত। কিন্তু তুই নিশ্চয়ই আগেই জানতিস তোর শরীরের অবস্থা কখন কিরকম থাকবে, কলকাতায় যাওয়ার আগে এই ভাবনামাি ভাবা উচিত ছিল।'

'বিশ্বাস করুন তখন মাথায় আসেনি। আর এখন মনে হতে পারে আমি নিজের হারের পেছনে একটা মুক্তি খাড়া করছি শরীরের দোহাই দিয়ে। তাই আমি ভাবছি আর কখনও এইসব প্রতিযোগিতায় নামব না।' স্পষ্ট গলায় বলল মোহর।

'তাহলে এখানে আর আসছিস না?'

'না। আসব। আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে আসব।'

ধ্যানদা হাসলেন, 'তুই এখন শুছিয়ে কথা বলিস কি করে? বইপত্র পড়িস?'

মাথা নেড়েছিল মোহর, 'এমন কিছু নয়।'

নন্দিনী জঙ্কেট দিয়েছিল। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল সে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় মোহরের চেয়ে খুব বেশি নম্বর পায়নি নন্দিনী। মোহর যে প্রথম ডিভিসন পাবে তা অন্নদা মুখার্জি জানতেন। রেজাল্ট দেখে তিনি একটু চিন্তায় পড়লেন। প্রথম ডিভিসন হয়েছে কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির ব্যাপারে একটু দৃষ্টিভ্রান্তি থাকল।

কলকাতার মুক্তারামবাগ ট্রিটে অন্নদা মুখার্জির কাকা থাকেন অন্তরালোকের বয়স আশির ওপরে। পুত্রদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তারা আলাদা থাকে। চিঠিপত্রে তাঁর সঙ্গে অন্নদা মুখার্জির যোগাযোগ আছে। তাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে অন্নদা মুখার্জি জবাব পেলেন, 'তোমার কন্যা আমার এখানে যেতে পড়শুন। করলে কোনও সমস্যা হবে না যদি সে এই শর্তগুলো মেনে চলে। আমি নিজে রান্না করে খাই। ভাত ডাল এবং একটী তরকারি। আমিষ বর্জন করেছি। আমার সঙ্গে খেতে গেলে তাকে ওই খাবার খেতে হবে। রাত নটর মধ্যে আমি শুয়ে পড়ি এবং তারপর আলো জ্বেলে রান্না পছন্দ করি না। আমার বাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারা চলবে না। তার কোনও কাজ আমার অপছন্দ হলে তাকে এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার বাড়িতে একটী রেডিও আছে সঁটা প্রত্যাহ সবাদ শোনার জন্যে বোলা হয়। অন্য সময় গানবাজনা বাজানো চলবে না। এইসব কথা মনে রেখে যদি তাকে পাঠাতে হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

মেয়ে মাহমাসুদিম খেতে পারে না বলে অন্নদা মুখার্জির স্ত্রীর আগুতি ছিল কিন্তু কলকাতার মত অজানা বড় শহরে গিয়ে ওই বাড়িতে থাকলে যে মেয়ে নিরাপদে থাকবে তাতে কোনও সন্দেহ না থাকায় দুপ করে রাজি হন। হোস্টেলে জায়গা পাওয়া খুবই মুশকিল এবং অন্নদা মুখার্জি জানতেন প্রেসিডেন্সি কলেজের মেয়েদের জন্যে কোনও হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের জন্যে দুটিময় মেসব হোস্টেলে আছে তাতে ভিড় উপচে পড়ে। অবশ্য মেয়ে যদি প্রেসিডেন্সিতে জায়গা না পায় তাহলে গ্র্যাবোনে যেতে হবে, এবং সেখানে হোস্টেলে ব্যবস্থা থাকায় মুক্তারামবাগ ট্রিটে যাওয়ার দরকার হবে না।

কলকাতায় যাওয়ার দুদিন আগে ধ্যানদার কাছে যাওয়ার পথে প্রাণেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুইশত বাইচটাকে আচমকা ধামিয়ে হাসল প্রাণেশ, 'হেরে গেলি?'

বুঝতে পারেনি মোহর, 'কিসে?'

'জুডোতে।'

'ওঃ হ্যাঁ। হারজিত তো আছেই।' মোহর মাথা নাড়ল, কোথায় ছিলি?'

‘বোম্বে গিয়েছিলাম। ওঁই।’

‘কেন?’

‘তোমার সঙ্গে কথা আছে।’

প্রাণেশের কথা বলার ভঙ্গি, বাইকের হ্যাণ্ডেল ধরা শরীরটার ছন্দ এমন একটা আকর্ষণ তৈরি করল যে চুপচাপ উঠে বসল মোহর। প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে প্রাণেশের বাইকে উঠে বসতে দেখে অনেকেই যে খুব অবাক হচ্ছে এটা বুঝতে পেরেও উপেক্ষা করল।

অনেকটা দ্রুত এসে প্রায় হাইগেয়েড ওঠার আগে নির্জন একটা কালভার্টের ওপর বাইক দাঁড় করাল প্রাণেশ, ‘নাম।’

মাটিতে দাঁড়িয়ে মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘এখানে এলি কেন?’

‘বললাম না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।’ বাইকটাকে রাস্তার ওপর থেকে নামিয়ে নীচের ঢালু জমি দিয়ে হাঁটতে লাগল প্রাণেশ। এখানে অনেকটা মুনোচ্চের ভিড় এবং তার ওপাশে সামান্য জলাভূমি রয়েছে। সেখানে পৌঁছে মোহর দেখল ওপরের রাস্তা চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় নীচে মানুষ রয়েছে।

বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল প্রাণেশ, ‘রঞ্জনা তোমার বন্ধু না?’

‘রঞ্জনা?’ তার সঙ্গে আলাপ আছে নাকি? মোহর অবাক হল।

‘হ্যাঁ। আমার কাছে রঞ্জনার লেখা পাঁচটা প্রেমপত্র আছে।’

মোহর হেসে বলল, ‘আচ্ছা!’

‘কথাটা তা নয়। রঞ্জনা অনেক ছেলেকে প্রেমপত্র লেখে, আমাকেও লিখেছে। কিন্তু ওর বাপ আমার পছন্দ লেগেছে। রঞ্জনার মামা পুলিশের ডি আই জি। আমাকে ডাগ কেসে ফাঁসাবার তালে ছিল লোকটা। খবর পেয়ে আমি বোম্বে চলে যাই। কিন্তু আমি যদি এর বদলা নিই তাহলে কি অন্যায় হবে?’ শব্দ মুখে জিজ্ঞাসা করল প্রাণেশ।

‘কিভাবে বদলা নিবি?’

‘রঞ্জনাকে কদিনের জন্যে হাওয়া করে দেব। পাবলিক জেনে গেলে কিরিয়ে দেব।’

‘তখন ডি আই জি চুপ করে বসে থাকবে?’

‘ডি আই জি-র বাপও ঝুঁজে পাবে না। তাছাড়া মেয়ে আমার সঙ্গে শুয়ে এসেছে জানতে পারলে ওর বাপের কিছু বলার মুখ থাকবে না।’

‘রঞ্জনা তোমার সঙ্গে যাবে?’

‘না। আমাকে কাদামা করতে হবে। এরকম হারামি মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।’

‘মুখ সামলে কথা বল প্রাণেশ।’

‘আচ্ছা?’ হারামিকে হারামি বলব না? প্রেমপত্রে লিখেছে তুমি আমার সব, আমার সব কিছু তোমাকে দিলাম। প্রত্যেকটা চিঠির নীচে নিজের লিপিস্টিক রাঙানো চোঁটের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে। অথচ দুদিন ‘ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু শুধু দুবার চুমু ছাড়া কিছু খেতে দেয়নি।’ প্রাণেশের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট।

‘তুই ওকে এখানে এনেছিলি?’

‘হ্যাঁ। এটা সেফ জায়গা।’

‘তোমার বাইকে তুলে এনেছিলি?’

‘হ্যাঁ।’ সরল গলায় জবাব দিল প্রাণেশ।

কিছুক্ষণ থেকেই মেজাজ তেতেছিল। রঞ্জনার লিপিস্টিক রাঙানো চোঁটের ছাপ অনেক অনেক বারের আগে সে-ও পেয়েছিল। মেয়েটার ওই অভ্যাস পাশ্চাত্যনি। সে বলল, ‘তুই যা হচ্ছে কর, আমি চললাম।’

‘চললি মানে?’

‘তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে না।’

‘যাঃ শালা! আমি কি করলাম?’

‘তুই কি ভেবেছিস আমিও রঞ্জনা যে এখানে এসে তোকে চুমু খাব?’

‘আমি কি একবারও তোকে বলেছি?’

‘তোরলে রঞ্জনাকে যেখানে এনেছিস সেখানে আমাকে আনলি কেন?’

‘বললাম তো জায়গাটা সেফ।’ হাসল প্রাণেশ, ‘তাছাড়া রঞ্জনার সঙ্গে যা করা যায় তোর সঙ্গে তা করব কি করে?’

‘তোর মানে?’

‘রঞ্জনা একটা মেয়ে। একেবারে মেয়েমানুষ। গায়ে পানকিউমের গছ। নরম নরম শরীর। সবসময় সেই শরীরটাকে দেখাতে ভালবাসে। ওটাই ওর ক্যাপিটাল। পৃথিবীর সব পুরুষ এমন খাবার খেতে ভালবাসে।’ প্রাণেশের কথা শেষ হওয়ার পর মোহর পা চালাল।

অপ্রত্যাশিত ছিল প্রাণেশ, উল্টে পড়ল একপাশে কিন্তু সেই অবস্থায় সে দ্বিতীয় আঘাতটাকে আটকে দিল। ‘আমার গায়ে হাত তুলেছিস মোহর, একবার ছেড়ে দিয়েছিলাম আজ তোমার ব্যারোটা বাজাব আমি। দেখি কোন বাপ তোকে বাঁচাতে আসে।’ উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করছিল প্রাণেশ। একটু দূরে সরে গিয়ে মোহর বলল, ‘যাঃ যাঃ। ওরকম কথা শুণ্ডাদের গিয়ে বলবি। মেয়েমানুষ তোদের খাবার, বলতে বলতে কি বলছিল তা আর ভাবিস না।’

প্রাণেশ উঠে দাঁড়াল এবং চকিতে তার প্যান্টের পায়ের দিকের পকেট থেকে একটা সরু ছুরি বের করে ফেলল, ‘তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। পেছন ফিরে দাঁড়া।’

ছুরিটা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল মোহরের। ছুরি হাতে যারা আক্রমণ করতে আসে তাদের সামান্যনোর কাদামা তার জানা আছে কিন্তু এই মুহুর্তে প্রাণেশের মূর্খের চেহারা পাস্টে গেছে। এই মুখ বেপেরোয়া ভাবে আহত করতে পারে, তেমন ব্বালে বুনও। মোহর সতর্ক গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই কি করতে চাইছিস? আমাকে ছুরি মারবি?’

‘না। কেটে দেব। তোমার পিঠে দু দুটা দাগ এমনভাবে কাটবে যে জিন্দেগিতে মুছেব না।’ প্রাণেশ তৃপ্তি সহকারে কথাগুলো বলামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহর। ঠিক কোনখানে আঘাত করল ছুরিটা হাত থেকে বাসে যাবে তা সে জানে। কিন্তু এবার প্রাণেশ সতর্ক ছিল। চকিতে হাত সরিয়ে নিয়ে জাপটে ধরল সে মোহরকে, ‘তুই ভুলে যাচ্ছিস আমিও অনেকদিন জুতো শিখেছি। এখন সোনামণি, আমাকে কাজটা করতে দাও।’ বলতে বলতে সে ছুরি ডগা দিয়ে আলতো করে মোহরের পিঠে চাপ দিল। যন্ত্রণা করকিয়ে উঠল মোহর।

‘আহা। লাগছে? এই জেলায় কোনও শালা আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না আর তুই হরিদাস, ঠিক আছে, জামা কাটব না, খোল জামা—।’

‘না আমি জামা খুলব না।’

আবার চাপ দিল প্রাণেশ, ‘খুলবি না চালাব?’

‘তুই আমার পিঠে কাটবি?’

‘হ্যাঁ।’ ঠোট মুড়াল প্রাণেশ, ‘তবে পিঠ দেখার পর নাও কাটতে পারি। তোমার পিঠ নিশ্চয়ই মেয়েদের মত নরম নয়? খোল।’

আদেশ মান্য করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। প্রাণেশ আঘাত করার দুরত্ব থেকে ওকে ছেড়ে দিতেই মোহর ধীরে ধীরে বোতাম খুলতে লাগল সার্টে। সোঁতকে এক হাতে নিম্নে নামাল, ‘তুই এর জবাব পাবি।’

প্রাণেশের নজর এখন মোহরের নিচোল পিঠের চামড়ায়। উল্টো দিকে মুখ করে মোহর দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ব্রায়ের ক্রিপটাও সাদা। আর তার ঠিক नीচে এক কোটা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। ছুরির সামান্য চাপেই ওই অবস্থা। হঠাৎ রক্তটা দেখতে দেখতে শিহরিত হল প্রাণেশ। ধীরে ধীরে মোহরের পেছনে এসে দাঁড়াল সে। মোহর চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সামান্য নিচু হয়ে ওই রক্তবিন্দুতে ঠোট ছোঁয়াল, ঠোটে তুলে নিতে চাইল আঘাত চিহ্ন।

ঠোটের স্পর্শ পাওয়ায় মোহরের মনে হয়েছিল ছুরি বসাজে প্রাণেশ কিন্তু ভুলটা বোরামার তার সমস্ত শরীর বিমবিন করে উঠল। মুহুর্তে সব শক্তি উধাও। এখন প্রাণেশ তার পিঠে একটীর পর একটা চুমু খেয়ে চলেছে আর মোহরের মনে হচ্ছিল তার অজানা অনেক অনেক দরজা, একের পর এক খুলে যাচ্ছে। এভাবে আকাশের नीচে নড়া হয়ে সে কখনও দাঁড়িয়ে থাকেনি আর এরকম সুখানুভূতি তার কখনও হয়নি।

এই দিনটির কথা কোনও দিন ভুলতে পারবে না মোহর। পরে, অনেক পরে এই নিয়ে সে অনেক ভেবেছে এবং যে ব্যাখ্যা পেয়েছে তা পাঁচজনের বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুশকিলাট হল পাঁচজনকে উপশোধ করে জীবনযাপন করা যায় কিন্তু সত্যি যা তাকে পাঁচজন স্বীকার না করলে অস্বস্তি হয়। যতই আত্মবিশ্বাস থাক, স্বীকৃতি পেলে ভাল লাগে।

প্রাণেশকে তার যেভাবে পছন্দ হয়েছিল তা সারাজীবন ব্যয়ে বড়োনার মত নয়। ওর কথা আলাদা করে কখনওই মনে পড়ত না বা পড়ে না। ওর মধ্যে যে বন্য আকর্ষণ ছিল তা শুধু ওকে দেখার পরই অনুভব করত মোহর। সেই ঘটনার পর প্রাণেশের সঙ্গে আর দেখা হয়নি এবং দেখা করার জন্য লালায়িত হয়নি মোহর। হৃদয়পুরে গিয়ে শুনেছে পুলিশ কেসে ফেসে গিয়েছে প্রাণেশ। এবার আর ছাড়া পায়ণর কোনও উপায় নেই। শুনে একটুও দুঃখিত হয়নি সে। এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। যে ছেলে রিকলবার এবং ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার অন্য পরিণতি হওয়ার কথা নয়।

অথচ সেদিন সে প্রাণেশের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল এটা খুবই সত্যি। উন্মুক্ত আকাশের नीচে নির্জন গাছগাছালির মধ্যে প্রাণেশ তাকে প্রাকৃতিক শিক্ষা দিয়েছিল। দেওয়া হয়ে গেলে বেশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আই, তুই এর আগে এসব করেছিস?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়েছিল মোহর, 'নেভার।'

'গুল মারছিস। তুই শালা ছেলেরের চেয়ে বেশি।'

কথাটা বলে কি বোঝাতে চেয়েছিল মোহর জানতে চায়নি।

'রেডি হয়ে নে।'

হয়েছিল। বাইকে ওঠার সময় হঠাৎই প্রাণেশ বলেছিল, 'তোকে একটা কথা বলছি। শরীরে কোনও অসুবিধে হলে আমার কাছে চলে আসবি।'

'কি অসুবিধে?'

'এসব করলে মেয়েদের যা হয়। সামনের মাসেই বুঝতে পারবি আর তখন দেরি করবি না। আমার হাতে ভাল ডাক্তার আছে। কেউ জানতে পারবে না।'

মোহর কথা বলেনি। তখন অতশত ব্যাপার নিয়ে ভাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। বাইকের ইঞ্জিন চালু করে প্রাণেশ বলেছিল, 'আর একটা কথা তোকে বলা উচিত। যদি দেখিস জ্বালা করছে, ঘামাটির মত বেরিয়েছে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করবি। আমার কাছে ওষুধ আছে, সেরে যাবে, ভয়ের কিছু নেই।' বাইক চালাল প্রাণেশ।

'ওসব হবে কেন?' প্রথম প্রশ্ন করল মোহর।

'হবেই যে তার কোনও মানে নেই। হতে পারে। অসুখটা আমি পেয়েছিলাম রানীগঞ্জের একটা বাজারি মেয়ের কাছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, বুঝ ভুগিয়েছিল। তারপর বোম্বে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করিয়ে ঠিক হয়েছি।' মাথা নাড়ল প্রাণেশ।

প্রাণেশ ঠিক কি বলতে চাইছে তা মোহরের মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু প্রাণেশ তার সঙ্গে যা করেছে তা একটা বাজারি মেয়ের সঙ্গে অপরীল্য করছে জানার পর শরীর গুলিয়ে উঠল। মনে হল বমি হবে। সে বাইকটাকে দাঁড় করাতে বলল। অবাক হয়ে প্রাণেশ দাঁড় করিয়ে বলল, 'কি হল?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে রাস্তার পাশে চলে গেল মোহর। বমিভাব প্রবল কিন্তু সেটা বেরিয়ে আসছে না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ফিরল। শান্ত গলায় প্রাণেশকে বলল, 'তুই চলে যা। আমি যাব।'

'ইচরি? এখান থেকে অনেক দূর।'

'সেটা আমি বুঝি।'

'তোমার মাথাখারাপ হয়ে গেল নাকি? দ্যাখ মোহর, আমি তোকে আলাদা চোখে দেখি। অন্য কোনও মেয়ে হলে আমি এসব বলতাম না। আমি তোমার ভাল করতে চেয়েছি আর তুই সেটাকে খারাপভাবে নিচ্ছিস।'

'আমাকে একা হাঁটতে দে গুজ।'

প্রাণেশ কাঁধ ঝাঁকাল কিন্তু মাথা বাড়াল না। বাইক নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। হাইওয়েতে ওর শরীয়াত বিন্দুর মত হয়ে গেল বমিটা এল। খানিকটা জল বেরিয়ে যাওয়ার পর স্বস্তি হল।

এই মুহুর্তে কোনও সুখানুভূতি নেই। বরং অদ্ভুত এক ধরনের আশঙ্কা ধীরে ধীরে চেপে বসছিল। হাঁটতে হাঁটতে মোহরের মনে হল এরকম একটা বিচ্ছিন্ন আনন্দদায়ক কাজের পর মেয়েরাই আইনি অনুবাহা যেআইনিভাবে মা হয়ে যায় অথচ পুরুষেরা নিরাপত্তে থাকে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত কোটি প্রতিবাদ করেও এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় যদি না মেয়েটি আগে থেকে সচেতন থাকে। আর অসুখ? বাজারি মেয়েটি প্রাণেশকে অসুখ দিয়েছে সে ওটা পেয়েছে নিশ্চয়ই কোনও পুরুষের কাছে। সেই পুরুষটির অবস্থা আর এক নারীর দান। ডিম আগে না মুরগি, এ নিয়ে তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। কিন্তু এই মুহুর্তে যদি প্রাণেশের ছড়াণা অসুখ তার শরীরে ডালপালা ছড়াতো থাকে তাহলে সে কি করতে পারে। ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকে কতবিস্মিত করছে চাইছিল সে।

দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস এল। ততদিনে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছে মোহর। তার সমস্ত দৃষ্টিক্তার অবসান ঘটিয়েছে প্রকৃতি। এবং এই কটা দিন সে প্রতিটি মুহুর্তে প্রাণেশকে ঈর্ষা করেছে, গালাগালি দিয়েছে এবং সেটা শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য পাল্টে সৃষ্টিকর্তার চৌদ্দপুরুষকে সংকার করেছে। মিলিত কর্মের দারিদ্ৰ্য কেন নারী একা বহন করবে। সে স্বীকার করতে বাধ্য যেহেতু এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই এবং যারা গিয়ে পড়ে দিতে আসেন তাঁদের দেবার যোগ্যতা নেই তাই এ নির্ণে মাথা ঘামানো নিরর্থক। পৃথিবীতে জন্মালে কিছু জিনিস মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক, কোনও যুক্তি সেখানে অচল, এভাবেই ভাবা উচিত। উচিত কিন্তু জ্বালা আসে মনে।

সেই বিকলের অভিজ্ঞতার জন্যে কোনও গ্লানি নেই মোহরের মনে। ঘটনটা ঘটেছিল হঠাৎই, ফাঁসর সময়ে মনে গ্লানি ছিল না বরং অপ্রত্যাশিত একটা সুখ পেয়েছিল শরীর এবং তার মস্তিষ্ক। আর কোনও মেয়ে ভালোনি। ছায়া, দিন পিচকেশ মনে বিস্ময় ছিল, এটা ঠিক। গল্প উপন্যাসের যখন বয়সকাল ফাঁদে ফটে তখন লোকেরা দুদলকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ প্রেমের ভানে জড়িয়ে রাখে। শাখাসিঁদুর মেমন বিবাহিতা হালাদের পাশাপাশি যেমন অবিবাহিতাদের প্রেম। অতীত প্রাণেশের সঙ্গ তার কোনও বন্ধন প্রেম হয়নি। প্রেম না হলেও যে সে আনন্দ পেয়েছে। এটা কি প্রেমইনি আনন্দ। যে ছায়া বলুক কতকালের জন্যে তার কোনও আক্ষেপ নেই।

পোছে। তিনি চট করে কোমরে কিছু নরমুণ্ডকে মালা করে জড়িয়ে নিলেন লক্ষ্মা নিবারণ করলেও। বাসারদাতা একই অবস্থান। যেতে দুর্গা লক্ষী শাড়ি পরতে-তাঁর হাতে নেওয়া পোছে পারে কারো পাশাচা শাড়ি ছিল। শাড়ির নীচে পেটিকাটা থাকত। অবশ্য সেখানুসং সেমিজ ধরা যাক সেমিজের চল ছিল। না কিন্তু একটা কিছু অন্তর্বাস নিশ্চয়ই থাকত। শাড়ি খুলে পড়ে গেলেও সেই অন্তর্বাসের বাঁহনও খুলবে এমনটা বিবাস কারা যায়। মাথা বড়ই গরম হোক মেয়েরা এমন ব্যাপারে খুব সেনসিটিভ হলে। যিনি প্রথমে কালীকে ওরূপে ভেবেছিলেন তিনি কেন যৌবনের এই বাড়াবাড়ি কল্পনা করছিলেন। ওই কল্পনার পোচেনে কি কোথাও কাবণ ছিল? সেসময় মেয়েদের নরমুটি তেঁকা প্রায় অসম্ভব ছিল। সংস্কারের সব কাজ সেরে মধ্যম্নরে অঙ্কুরের শ্রীক পোচ পেতেই তেনকরা কারা স্বামী। সেই অবদমিত কামানীও না হলে চেঁহারায়ে প্রকাশ পোছেও। কালীমুটিয়ে খেসব ব্যাথা চান্না আছে তা ভঙেদের শ্রদ্ধাস্তমু। মেহেরের মনে হল কালীমুটিয়ের অন্য রিহাঙ্ক ছিল। সেই রিহাঙ্কই প্রকৃতির বিরুদ্ধে। জেনেওনাঁহে তিনি নীলিকা হয়েছেন। যে নম্ব নারীমুটি দখলে পুরুষের কামাভ জাগে সেই মূর্খিতেই তাদের মূখু করিতে চেয়েছেন তিনি। যে পুরুষেরা নারীকে ভোগে কাহাই কখনাও কব বলে মনে করে তাদের মূখু দিয়ে তিনি নিজের লক্ষ্য নিবার করেছেন। এ প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। তিনি যদি জিত্ত না বের করতেন তহলে পুরুষরা তাঁকে ছিড়ে খেত। হুতোয়িত কামাভের নারী চিরকাল জিতের ব্যবহার করক। যুঝ যুঝ বুজ্জ নারী পুরুষকে দুঃশাসন বহাঃ সুযোগ দিয়েছে। যুঝ খুলে সে তার পায়ের তলায় জুজ্জ পাবে। সেই জমি 'সন্দুব' হলে তো কথাই নেই। অবশ্য মা কালীরা এই প্রতিবাদী চরিত্র বদলননারী বুঝতেই পারেনি। মা কালীকে এভাবে কল্পনা করেছিলেন তিনি কি একজন পুরুষ? মেহের সঠিক কহােন না। কিন্তু প্রথা ডাঙতে পারা সেই মানবচাঁদ অবশ্যই নয়ম।

গোলকপতি অন্নদা মুখার্জিকে লিখেছিলেন তিনি নিজে রান্না করে খান এবং সেই রান্নাই মোহরের খেতে হবে। দুবেলা খাওয়ার সময় কাজের লোকটি তাকে পরিবেশন করে। ভাত ডাল ভাজা তরকারি এবং দুধ। শেষ পদটি খায় না মোহর। দিনরাত্তে এক মনে। একজন বৃদ্ধ যে এসব রান্না করছেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসা করার বিষয়। কোনও দিন প্রশ্ন করেনি সে। কোথায় কোন ঘরে বসে গোলকপতি এসব রান্না করতে যান তা জানতেও চায়নি।

সকাল বিকেলে যাওয়া আসার সময় মোহরকে গোলকপতির বৈঠকখানার সামনে দিয়ে পা ফেলতে হয়। দরজার কাছে ইঞ্জিনের পেতে বসে থাকেন বৃদ্ধ। কোনও কথা হয় না। এই বিশাল বাড়িটিতে দিনভর পায়রা ডেকে যায়। সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছায়ায় মাখামাখি হয়ে। এরকম বাড়ির দেতলার কোণের ঘরে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না মোহরের। এই প্রথম বাবামাকে ছেড়ে একা রয়েছে সে। প্রথম দিকে খুব একা লাগত। হলদপুরে দু'দিনটো চিঠি পরপর লেখার পর মনে হল একই কথা লিখে। চোখপার স্থির হয়েছিল সে।

মুন্ডারামবাণু ছিট থেকে কলেজে পৌঁছায় রাষ্ট্রাটা শুকিয়ে ফেলার কোনও উপায় নেই। ভিড়ে ভর্তি এবং ভাঙচোরা পথটায় ইটা সুবন্ধর নয়। বরং কলেজের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে ভাল লাগে। এখন কলেজে তেমন জোরালো কোনও আন্দোলন হচ্ছে না। পড়াশুনার অবস্থাও যা পুরোপুরি। কলেজে মোহর দেখল তার মত সার্চ প্যান্ট পরা মেয়ের সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই অবশ্য শালায়ার কামিজ অথবা স্কার্ট কিন্তু জিনসের পায়ের দিকে ঝাঁক তুলে অনেকেই আসছে। এদের কেউ কেউ তার চেয়ে বেশি নম্বর পেলেও যে কিনিসটা সে টের পেল তা হল হলদপুরে মানুষ হবার কল্যাণে কথাবার্তায় ইটাচলায় তার মধ্যে যেন একটু মফস্বলি গন্ধ রয়ে গেছে। এদের অনেকেই তার থেকে বাইরের জগতের খবর অনেক বেশি জানে।

তুলনায় ছেলেরা যেন অনেক সহজ। তুই তোকারিত মোহর অভ্যস্ত। এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে ছেলেরের বহুত্ব হয়ে গেল। তৃতীয় দিনেই সে কয়েকজনের সঙ্গে রান্না পেরিয়ে কফি হাউজে গেল। বিশাল হলঘরে গমগমে শব্দের মধ্যে কোণের টেবিলে বসে হঠাৎ গানদার কথা মনে পড়ে গেল। ব্যানদা চাইতেন সে নিয়মিত অনুশীলনের মধ্যে থাকুক। ব্যানদা বলেছিলেন, 'বাঙালি মেয়েদের কি গোলমাল জানো, অল্পবয়সে তারা যা শেখে তা বেদিসিন আঁকড়ে ধরার তামিল বোধ কবে না। যে মেয়েটি খুব ভাল কণ্ঠক নাচত পনেরো বছর বয়সে, তাকে পঁচিশে দেখবে মোটুসোটি হয়ে গিয়েছে। নাচের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। তুমি যেটা শিখেছ সেটা চরিত্র না থাকলে জং পড়তে বাধ্য। আর তা হলো নিজেকেই প্রশ্ন করো এত কষ্ট করে শেখার কি দরকার ছিল।'

অনিদ্রার যে কথা থামিয়ে তাকে দেখছে বুঝতে পারেনি মোহর। হঠাৎ একটা হাত মুন্ডের ওপর ওঠানন্দা করতাই সচেতন হল সে। অনিদ্রা হাসল, 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি?'

'সোজা হল সে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, মানে—'

'বাড়ির কথা মনে পড়ছে?'

'না। আমি একজনের কাছে জুড়ো শিখতাম। মানুষটা একদম আলাদা ধরনের।'

'জুড়ো শিখতিস? তুই?'

'কেন? অবাক হবার কি আছে।'

'কেউ যদি অ্যাটাক করে তাহলে নিজেকে ইচ্ছাতে পারবি?'

'যদি সে আমার চেয়ে ভাল জুড়ো না জানে তাহলে পারবে।'

কথাবার্তা অন্যদিকে ঘুরে গেল। মোহর আবিষ্কার করল জুড়ো ক্যারাতো কুৎসু সম্পর্কে এরা অনেককিছু জানে। সৌমিত্র তো বিখ্যাতদের নাম বলে দিল। তারপর হুসলি এবং বুসলি থেকে সিনেমার চল গেল আলোচনা। কিন্তু ওরা যে তাকে আলাদা চোখে দেখছে তা টের পাইল সে।

খবরটা কলেজেও ছড়িয়ে গেল। কলেজের একটি মেয়ে গলবারের জুড়ো প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিল এটা যেন গর্বের ব্যাপার। সিনিয়ার ছাত্ররাও যেতে সম্মতি করে কথা বলে

যাচ্ছে তার সঙ্গে। সুজান নামের একটি মেয়ে একদিন এল মোহরের কাছে। কলেজের মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল মোহর। সুজান খার্ড ইয়ারের ছাত্রী, লম্বা, সুন্দরী হিসেবে নিজে বেশ সচেতন। বিদেশি গাড়িতে কলেজে আসে। হাতে সেনার চেন, চুল কখনও বাঁদে না অথচ সেগুলো বেশ মায়াময় হয়ে পিঠে ছড়িয়ে থাকে।

'তুমি মোহর?' সুজান জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ই্যা বলল মোহর।

'তুমি জুড়ো জানো?'

'খুব সামান্য।'

'আমাকে কোচ করবে?'

'কেন?'

এমন প্রশ্ন বোধহয় আশা করেনি সুজান। বড় চোখে মোহরের দিকে তাকিয়ে আলাতো হাসল, 'তুমি বোধহয় আমাকে চেনো না। আমি এবার মিস ক্যালকাটা নামছি। মডেলিংয়ের অফার আছে প্রচুর।'

'এর সঙ্গে জুড়ো শেখার কি সম্পর্ক?'

'ওয়েল। ধরো, নিজেকে ইচ্ছাতে চাই।'

'তুমি তো রাষ্ট্রাটাই হাটো না। অজ্ঞানো বাজে লোকের পাশায় পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। যারা তোমার আশেপাশে আসবে তারা তো বিশেষ এক ক্লাসের মানুষ। তারা নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদে ফেলবে না।' মোহর হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

সুজান মাথা নাড়ল, 'পুরুষমানুষ একলা হলে তাদের কোনও ক্লাস থাকে না। আমি স্থিতিয়ার কাজকে অনুপ্রাণিত করি না। অবশ্য তুমি মনে কোরো না আমি তোমাকে এমন পরিশ্রম করাব। সপ্তাহে একদিন মাসে চারশো টাকা দেব।'

মুন্ডার ওপর না বলে দিতে গিয়ে হঠাৎই সামলে নিল মোহর। অনেকেই তো অনেক কিছু করে রোজগারের জলো। চারশো টাকা মাসে পেলে হলদপুরের ওপর চাপ কম পড়বে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'সন্টলোকে।' আনন্দের ডাইভার তোমাকে নিয়ে আসবে, পৌঁছে দেবে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একমাস পর যদি দেখি তুমি ইন্সট্রু করছ না তাহলে—'

'আমিই তোমাকে নিশ্চিত দেব।'

কলকাতার কিছু মানুষ কি বিশুল বৈভবের মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন তা সুজানের বাড়িতে দেখতে পেল মোহর। প্রথম দিন, সেটা রবিবারের বিকেল, গাড়ি থেকে নামতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। বাগানঘেরা দেওলা বাড়ি। নীচের বসার ঘরটির সাজগোজ দেখে বোঝা যায় বিস্ত এবং ফ্রটি এখানে নিবেশিত হয়েছ। ইলো এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরল ছবি ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত জুড়ে থাকত না। কাজের লোক তাকে দেওয়াল নিয়ে যাওয়ার সময় পাশের ঘর থেকে গলা ভেসে এল। কাজের লোক বলল, 'দিদিমণির কাছে এসেছেন।'

'এঘরে এসো ভাই।'

অতএব মোহর পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। গোল টেবিলের ওপর তাসের স্তুপ এবং তার চারপাশে জনা পাঁচেক মধ্যবয়সী বসে আছেন তাস হাতে। দশটি চোখ এখন তার ওপর। মোহর দেখল লম্বা লম্বা গ্রাসে পানীয় রং ছড়াচ্ছে। পাঁচজনের গায়ের রং খুব ফর্সা, ব্রাউজের কাপড় সর্বস্বত্বময়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাকছেন?'

'তুমি মোহর? সুজান তোমার কথা বলেছে।' মোটাটো মহিলা এবার পাশবর্তিনীদের দিকে তাকালেন, 'সুজানের সঙ্গে পড়ে। জুড়ো জানে।'

‘মাই গড!’ একজন চোখ বড় করলেন।

‘ঠিক আছে, ওপরে যাও।’ সুজানের মা মাথা নাড়লেন।

এবাড়ির দোতলার ছাদে বাগান আছে, ঘাসের লনের পাশে একটা মিনি সুইম্পুলও। সুজান যে এর মধ্যেই জুড়োর পোশাক কিনে ফেলবে তা আশা করেনি মোহর। ওকে সেই পোশাকে দেখে মোহরের মনে হল মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। রঞ্জনার সৌন্দর্য একরকমের ছিল কিন্তু সেটা সুজানের ধারে কাছে আসে না। ভাল পড়ুয়া হলেও জুডো-ছাত্রী হিসেবে সুজান খুবই নিম্নস্তরের। শরীর ঠিক রাখার জন্যে দু-একটা আসন আর ডায়েটিং করা ছাড়া কখনই কোনও খেলাধুলা করেনি। জড়তা সর্বাস্থে। খোলা ছাদে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ইপিংয়ে পড়ল সুজান। সেটা লক্ষ্য করে হাসল মোহর, ‘এটুকু সাতদিন ধরে চেষ্টা করো। একটু সড়গড় হলে তারপর দেখা যাবে।’

চোয়ালে বসে ত্যাগালে দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সুজান বলল, ‘আই উইল ট্রাই।’

‘চেষ্টা করলে রপ্ত করা এমন কিছুই নয়।’

‘তুমি কতদিনে শিবেছ?’

‘অনেক বছর। এখনও ভাল শিখিনি।’

বাড়ি ফিরে মোহরের মনে হয়েছিল প্রায় কিছুই না করে সে টাকাগুলো নেবে। সুজানের শব্দ যতদিন না মিটে যাবে ততদিন এই যাওয়া আশা। কিন্তু পরের সপ্তাহেই গিয়ে সে বেশ অব্যাক। সুজান যে সাতদিন ধরে অনুশীলন করেছে তা বুঝতে অবশিষ্ট হচ্ছে না। তার শরীরের মূর্তবোধই সেকথা বলে দিচ্ছে। ছোটখাটো ভ্রুটি মোহর দেখিয়ে দিতেই সে সেটা শুধরে নিতে পারল। সেদিন মোহর বলেছিল, ‘তুমি দেখছি খুব সিরিয়াস।’

‘আমি যেটা করব বলি সেটা সিরিয়াসলি করি।’

‘তোমার এই পরিশ্রম করতে ভাল লাগছে?’

‘সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় লাগছে না। কিন্তু আমি হেরে যেতে চাই না।’ সুজান হাসল, ‘এই জন্যে ছেলদের সঙ্গে আমার বনে না।’

‘কি রকম?’

‘যে কোনও ছেলে প্রথমে এগিয়ে আসে পরাজিতের ভঙ্গিতে, কিন্তু যেই সে পায়ের নীচে জমি পায়মনেই বিজয়ীর মত ভঙ্গি করে। আমার ছারা সেটা মানা সম্ভব নয়।’ সুজান মাথা নাড়ল,

‘তোমার কোনও নিজস্ব ছেলে বন্ধু নেই?’

নিঃশেষে মাথা নেড়ে না বলল মোহর।

‘কেন? তুমি তো বেশ আট্টাকটিভ।’

‘হয়তো জুডো জানি বলে কেউ এগিয়ে আসে না।’

‘হতে পারে। মার খেতে কেউ পছন্দ করে না। আমি তো টায়ার্ড হয়ে গেলাম। রোজ অন্তত তিনটে আফ্রোড, ফোনের পর ফোন। কিন্তু যেই ওরা শব্দর পাবে আমি জুডো শিখছি তখনই পালাবে। আমি তাই চাই।’

‘কেন?’ মোহরের মজা লাগছিল।

‘বললাম না, আমি টায়ার্ড। ছেলেরা প্রেম করে দুটো লক্ষ্য নিয়ে। হয় বিয়ের আগে শরীর দেখবে নয় বিয়ের পর। বিয়ের পর সেই প্রয়োজনটার ধার একটু কমে গেলে তোমাকে একটা আসবাব বানিয়ে ফেলবে। মাকে তো দেখছি। সারান্না বন্ধুদের সঙ্গে রামি খেলে আর বিয়ার খায়। বাবার সঙ্গে কথাই হয় না। কিন্তু তবু পাবলিকলি ওরা স্বামী স্ত্রী, দুজনে নাকি প্রেম করে বিয়ে করছে।’ মুখ বেকাল মোহর।

এসব কথা তো মোহরেরও। কিন্তু সে এর সঙ্গে আর একটু অন্যরকম ভাবে। কোনও একটা বাংলা উপন্যাসে সে নায়িকাকে কীভাবে দেখেছিল এই বলে, ‘তুমি প্রভারক, তুমি লম্পট, তুমি

আমাকে ভোগ করে সর্বশ্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।’ পড়ার সময় মেয়েটির জন্যে খুব সহানুভূতি জেগেছিল। উপন্যাসটি বাঙালি পাঠিকারা খুব পছন্দ করেছিল তা সংস্করণ দেখলে বোঝা যায়। পরে, অনেক পরে, ঘটনাটা মনে পড়লে হাসি পেয়েছে মোহরের। দুটো মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে যা কিছু একসঙ্গে করে তখন তার দায়িত্ব এবং ফল দুজনের ভাগে সমান থাকে। তাহলে শুধু পুরুষটি কেন নারীকে ভোগ করবে? নারীও তো সেসময় পুরুষটিকে ভোগ করেছে। সেকথা নায়িকা কখনও বলেনি। আর ভোগটোপ নির্বিবাদে করার অনেক পরে নায়িকার মনে হল নাকব তাব সর্বশ্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে। কি রকম বোকা বোকা ব্যাপার। তার যা ছিল সবই তো থাকবে তবু নিজেকে নিজস্ব ভাবতে ভাল লাগে বলেই বলা। ওতে সহানুভূতি পাওয়া যায়। মেয়েরা চিরকাল ওইরকম সহানুভূতি পাওয়ার পথে ইটাই সুবিধেজনক মনে করে এসেছে।

সুজানের সঙ্গে মোহরের বয়সের সামান্য পার্থক্য কিন্তু বন্ধুত্ব তৈরি হতে অসুবিধে হল না। সুজানের চেহারা, টাকাপয়সা অথবা স্টাইলের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই কিন্তু মুখের ওপর সাদাকে সাদা বলতে ও একটু দ্বিধা করে না। অনিন্দা বা সৌমিত্রা এ নিয়ে তাকে আওয়াজ দিয়েছে, ‘ঠিক আছে, দেখব কতদিন তোদের বন্ধুত্ব থাকে?’

‘তোরা এত দীর্ঘা করিস কেন বল তো?’

‘দূর! দীর্ঘা কেন হবে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করি না।’

‘এটা তোর মধ্যবিত্ত কমপ্লেক্স। কাছে থেকেই পারিস না বলে নিন্দে করিস।’

কথাগুলো সৌমিত্রের সঙ্গে হচ্ছিল। অনিন্দা শুনিছিল চুপচাপ। এবার বলল, ‘যার যা ইচ্ছে তাই করুক সৌমিত্র। মোহর যদি জুডো শিখিয়ে চারশো টাকা পায় তাহলে আমাদের মাঝে মধ্যে কফি জুটবে, এটুকুই লাভ।’

কথা হচ্ছিল কফিহাউসে বসে। সুজানের কফিহাউস মোটেই পছন্দ নয়। এখানে এলেই নাকি তার মাথা ধরে। ওই টিংকার সহ্য হয় না। টেবিলে টেবিলে যে সব কণ্ট্রার জড়াই হয় তা সমুদ্রগর্জনের মত শোমালও তার মাথায় আঘাত করে। সুজান বলে, ‘বাঁজারের মধ্যে কি করে অতক্ষণ তোমরা বসে থাকো?’

কিন্তু মোহরের মোটেই বাজার বলে মনে হয় না। তার কেন্দ্রলই মনে হয় এই কফিহাউস থেকেই অনেক বিখ্যাত লোকদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ এখনও সমুদ্রের পর আসেন। এখানকার ঐতিহ্যই আলাদা। একদিন সৌমিত্র একজনকে নিয়ে এল। লম্বা গাছ, মুখে হালকা দাঁড়ি, সুন্দর চেহারা। কফি নিয়ে এল তার এই টেবিলে আসার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। সৌমিত্র বলল, ‘এক কাপ কফি খেয়েই চলে যেতো তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। এরা আমার বন্ধু আর ইনি করি দীপ্ত সেন।’ সৌমিত্র একটু চেয়ার এগিয়ে দিল।

বসতে বসতে দীপ্ত বলল, ‘আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করি কিন্তু কবি বই।’

অনিন্দার মুখ চোখ পাশেই গিয়েছিল। বলল ‘কিন্তু আপনার কবিতা তো আমাদের ভাল লাগে। নিয়মিত পড়ি।’

‘নারী পত্রিকা ছাপে বলে আপনারা পাঠক। আরও পাঁচটা লেখা পড়ার সঙ্গে কবিতায় চোখ বুলিয়ে নেও।’ কেউ কি পকেটের পয়সা খণ্ডে করে কবিতার বই কেনেন?’

ওরা তিনজনের কেউ উত্তর দিতে পারেনি। দিলে কারও ভাল লাগত না। দীপ্ত সেন বলল, ‘আজকেই একজন প্রকাশকের কাছে গিয়েছিলাম। কবি কবিতার বই ছাপেন। বলেনি, যে বই বিক্রি হবে না সে বই ছেপে লোকসান কেন করব? জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অথবা সুশীল গাঙ্গুলির কবিতার বই হলে ছাপতে পারি। লোকে এদের কবি বলে, বইও কেনে। অতলোক উপদেশ দিলেন, অন্য কবিতার বই যেভাবে বের হয় তাই করুন। তিন চার ফর্মার বই তো, নিজের পয়সায় ছেপে দেবেন কি রকম বিক্রি হবে। রেসপন্স গেলে আমার কাছে চলে আসবেন।’

মোহর জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার কবিতার বই বিক্রি হয় না?’

‘না। কারণ আজ পর্যন্ত কোনও বই প্রকাশিত হয়নি।’ দীপ্ত সেন হাসল।
অনিদ্রা অবাক গলায় বলল, ‘আশ্চর্য! আপনার কবিতা তো সমস্ত শারদীয়া সংখ্যায় বের হয়। বাঙালি পাঠক এখন পয়সা দিয়ে কবিতার বই কেনে না?’

দীপ্ত সেন মাথা নাড়ল, ‘হয়তো আমরা ভাল লিখতে পারছি না বলে কেনে না। অবশ্য কাগজগুলো তো ছাপছে, এটাই বা কম কথা!’

মোহরের মনে হল তার যদি টাকা থাকত তাহলে ভদ্রলোকের একটা কবিতার বই ছেপে দেবত সত্যি কি অবস্থা! কিছুক্ষণের মধ্যে প্রসঙ্গ পাশে গেল। এখন দীপ্তই কথা বলছে আর তিনজন শুনছে। দীপ্ত বলছিল, ‘জীবনযাপনের ধরন এখন বদলে গেছে। আগে একজন পদ্মকার এবং পদ্মকার সমান মর্যাদা পেতেন। কারণ তখন মানুষ মূল্যবোধে বিশ্বাস করত। আমাদের বিশ্বাস ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত যেসব কবির নাম এবং তাঁদের কবিতার লাইন আমরা উচ্চারণ করি তারা যদি এসময় জন্মাবেন তাহলে মেটেই বিখ্যাত হতেন না। টি এস ইলিয়ট—এর মত কবি এই মুহূর্তে লন্ডনে বসে কবিতা লিখবেন কিনা আমরা জানি না। এখন গদ্যের যুগ। এবং সেই গদ্যে যদি প্রতিবাদী ভাষা অথবা জিল্লরের দাঁপট থাকে তাহলে তার লেখক এই গরিব দেশেও মার্কিট চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। দেখছেন না, আমাদের কবিরা কিকরম গদ্য রচনার সঙ্গে যুক্তছেন। এটা সত্যি কিন্তু মেনে নিতে সঠিক হয়।’

সৌমিত্র বলল, ‘কিন্তু সেইসব কবিরের গদ্য পাঠক লুফে নেয়নি।’

দীপ্ত মাথা নাড়ল, ‘একমাত্র সুনীলদা পেরেছেন।’

মোহর বলল, ‘আপনি চেষ্টা করবেন।’

‘ভেতর থেকে গদ্য লেখার আগ্রহ আসেনি। এলে কবর। আমি যা জানি তা বলার মিডিয়াম হিসেবে কবিতার ফর্মই ঠিক। অন্য ভাষা মনে এলে যা কবিতায় ঠিক মানাবে না তা গদ্যে লেখার চেষ্টা করতে তো আপত্তি নেই।’ দীপ্ত হাসল, ‘একটা সুবিধে হল আজকালকার গল্প উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে স্বরের কাগজের ভাষার কোনও পার্থক্য নেই। মনে হয় অসুবিধে হবে না।’

‘তাহলে আর সবাই সফল হচ্ছেন না কেন?’

‘কবিরা খুব ভাগ্যবান! বিষয় নিয়ে গদ্য লিখছেন। তাই।’

দীপ্তকে ভাল লাগল মোহরের। প্রথম দিন ব্যক্তিগত কথা হয়নি। এমনকি বাড়ি ফিরে এসে মোহরের খেয়াল হল দীপ্ত তার নাম জিজ্ঞাসা করেনি। ওরা প্রেসিডেন্সিতে পড়ে এটুকুই জেনেছেন। সে নিজেও জানে না। দীপ্ত কি করে, কোথায় থাকে। একটি মানুষ বড় পরিচয় কবিতা লেখে, এটাই তার সব পরিচয় নয়। অবশ্য কবির দাম সৌমিত্রের আপত্তি সত্ত্বেও দীপ্ত দিতে দেয়নি।

সুজানকে দীপ্তর কথা বলেছিল মোহর কিন্তু সুজানা কোনও গুরুত্ব দেয়নি। বলেছিল, ‘প্রত্যেকটা প্রফেসরেরই ভাল মদ দিক আছে। কিন্তু যেসব মানুষ খুব হতাশার মধ্যে বাস করে তাদের আমি সমর্থন করি না।’

‘এমন তো হতে পারে ওঁর কবিতার বই ভাল বিক্রি হবে।’

‘এমন তো হতে পারে আমি মিস ইউনিভার্স হবে। যদি হই তাহলে তাব জন্যে আমাকেই উদ্দীপ্ত হতে হবে।’

আর কথা বাড়ায়নি মোহর। কিন্তু দীপ্তর প্রতি তার ভাল লাগা কমছিল না। দীপ্তর কবিতা কানাজে ছাপা হলেই সে পড়ে ফেলত। সব লেখাই যে ভাল লাগত তা নয়। কিন্তু মোহরের মনে হত দীপ্ত একজন একা মানুষের কথা বলতে চায় যে আঁদে কোন্‌ও দুখে নেই। মাঝে মাঝে দীপ্ত কবিতাগুলো আসে, তখন এ নিয়ে আলোচনা হয়। নিজের কবিতা বাপোরে দীপ্ত কিছুই বলতে চায় না। অন্যরা বললে চুপচাপ হাসে। মোহর জেনেছে দীপ্ত এখন এম. এ পড়ছে কিন্তু পড়ায়

তেমন আগ্রহ নেই। চাকরি জেটোতে পারলে বরং সে খুশি হয়। থাকে সুকিয়া ট্রিটে। রাস্তাটা নাকি মুক্তারামবাথ ট্রিট থেকে বেশি দূরে নয়।

সময়ের পর অথও অবসর, কলেজে যোগাড়র আগে বাড়িতে একবকম একাই থাকা, মোহরের নব্বীয়ার কথা মনে পড়ত খুব। নব্বীনা ডাক্তারি পড়ছে এই কলকাতাতেই অথচ তার সঙ্গে দেখা হয়নি তার। হলদপুর থেকে ওর টিকানা আনানো এমন কিছু নয় কিন্তু সেটা করা হয়নি। নব্বীনা তাকে লেখালেখির কথা বলত। ইদানীং এইভাবে একা থাকতে থাকতে মোহরের মনে হত লিখলে হয়। কিন্তু কি লিখবে? যে বিষয়ই মাথায় আসে মনে হয় তার আগে কেউ না কেউ তা লিখে গেছেন। যদি বিষয় মনে ধরে তখন ভাবনা আসে সেটা কিভাবে লিখবে? গত তিনচার মাসে সাহিত্যের নানান ভলু নিয়ে কবিতাগুলো এও আলোচনা শুনেছে সে যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে কি গদ্য লিখবে না গদ্য? দীপ্তর লেখা যে সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তার কবিতাও মোহরের কাছে ছিল। পাঠো উল্টে চোখ রেখে মোহরের মনে হচ্ছিল সে পারবে কবিতা লিখতে। কিন্তু দুদিন চেষ্টার পর দ্বিতীয় লাইটিং কিছুতেই কলম থেকে বেরিয়ে এল না। এ বড় যন্ত্রণার সময়। যেতে বসতে পড়তে অশ্রুপ্তি। মাথার ভেতর ‘যেন কাঠেরেকরা একটানা ঠুকিয়ে যাচ্ছে। মোহরের মনে পৃথিবী সমস্ত কবিরের প্রতি দ্বিধা বাড়ছিল। তারা কি স্বচ্ছন্দ লাইনের পর লাইন লেখে।

সুজানের গাড়ি এল রবিবারে। তৈরি হয়েছে ছিল মোহর। ড্রাইভার তাকে চিঠিটা দিল। সুজানা লিখেছে, ‘আমি খুব দুঃখিত তোমাকে আগে জানাতে পারিনি। কারণ আমি ভেবেছিলাম রাজি হব না কিন্তু শেষপর্যন্ত হতে হচ্ছে। আজ গ্র্যান্ডে একটা শো-তে আমি পার্টিসিপেট করছি। ফ্যানশান শো। তুমি এলে আমার ভাল লাগবে।’

মোহর একটু বিরক্তই হল। সে ইতিমধ্যে সুজানের দেওয়া থাম নিয়েছে বটে কিন্তু কখনই নিছক মাইনে পাওয়া লোক বলে মনে করেনি। সুজানাও তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করেনি। খরও এর ফ্রিয়কলাপে মাকেমায়ে সন্দেহ হত রঞ্জনার কিশোরী বাসেরে অভ্যস্ত সুজানেরও আছে। কিন্তু শেষমুহূর্তে এমন সাদারলি ডসিগত সুজানা নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে যে সেই সন্দেহ আর মনে দানা বাঁধেনি। তবে ইদানীং রবিবারের বিকেলে যত তাড়াতাড়ি পারে সুজানা অনুশীলনের কাজ শেষ করে গল্প করত। ওর ওয়ার্ডারোবের পোশাকের সংখ্যা এবং বাহার দেখে চমক চমক গাছ হয়ে গিয়েছিল মোহরের। অথচ থাকে বলে মেয়েলিগত তা সুজানের একমদ ছিল না।

মোহর ভাল সে যাতে না। ছাত্রী হিসেবে সুজানা আজ নিশ্চয়ই অন্যান্য করেছে। ফ্যানশান-শো একদিনে ঠিক হয়নি। ও জানত তবু বলেনি। ধানন্দা হলে জীবনে ওর মুখ দেখতেন না। তারপরে মনে হল একবার অঙ্কত সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহাজা গ্র্যান্ড হোটেল এবং ফ্যানশান শো-এর জগৎ তার অজানা। দেখে এলে মন হয় না। পরে সুজানকে এ নিয়ে কথা শোনালেই হবে।

ড্রাইভারের কাছে কাছ ছিল অতএব ভেতরের ঢুকতে অসুবিধে হল না। সুদৃশ্য হলঘরে সুফাচ্ছত নারীপুরুষের ভিড়ে নিজেকে খুব খাপছাড়া লাগছিল মোহরের। সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে চারপাশে তাকাল। মনে হচ্ছিল এখানকার প্রতিটি মানুষ যেন সুখের আঁচে গা ঝেঁকে নিচ্ছে। তার সার্টশাট পরিষ্কার কিন্তু এদের সঙ্গে মানাচ্ছে না। শো আরম্ভ হল। বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে মডেল হয়ে মেরোরা একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের যাতায়াতের জন্যে উঁচু প্যাসেজ সাজানো ছিল। সেই প্যাসেজে হেঁটে এসে অঙ্কত ডসিগত তারা দর্শকের দিকে ঘুরে আবার ফিরে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে সুজানা নেই। দেখতে দেখতে মোহরের মনে হচ্ছিল এরা দম দেওয়া পুতুল। ভেতরের কেউ চাষি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর তার জোরে এরা এগিয়ে আসছে দর্শকের সামনে, যম কুরিয়ে যোগাড় টান ধরতেই ফিরে যাচ্ছে। ক্রমশ ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে উঠল ওর কাছে। অথচ এক একজনকে দেখে দর্শকরা যেভাবে হাততালি দিচ্ছে তাতে তারা যে

খুশি এতে কোনও সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে মডেলদের পোশাকের বিবরণ মাইকে বলে দেওয়া হচ্ছে। এদের বেশির ভাগ পোশাক পরে কেউ রাত্তায় ইটিতে পারবে বলে মনে হল না মোহরের। পোশাকের ডিজাইন এবং তার আধুনিকতা নিয়ে এক প্রস্ত বক্তৃতা দিনের আজকের শো-এর ডিজাইনার। কোমড ড্রিন্স চল এল দর্শকদের হাতে হাতে। তাতে চুমুক দিতে দিতে মোহরের মনে হল সে বোধহয় খুব কম বোঝে। অন্তত পোশাক নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে তা তার জানা নেই। অতএব দেখে যাওয়াই ভাল। এরকম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলঘরের আরামদায়ক চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা খেতে খেতে অন্য ভাবনা না ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিরতির পর আবার শো শুরু হল। ডিজাইনার ঘোষণা করলেন এবারের পোশাক বেডরুমের। বাইরের মানুষের সোটা দেখার নয়। প্রথম শর্ত থাকবে ওই পোশাকে যেন নিজের আরাম হয়, ঘুম আসে স্বচ্ছন্দে। দ্বিতীয় শর্ত যদি কোনও প্রিয়জন সঙ্গী হিসেবে থাকে তার দৃষ্টিতে যেন আরাম আসে।

আমাদের চেহারা বদলে গেল। নীলাভ পাতলা একটা আলোর দুটি যেন ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। মোহরের মনে হল স্বপ্নের আবহাওয়া যেন এমনই হয়। এবার মৃদু বাজনা শুরু হয়ে গেল। পরিবেশটা দারুণ রোমান্টিক হয়ে যেতেই ভেতর থেকে মডেল বেরিয়ে এল। কাঁধ থেকে পা ঢাকা সাদা পোশাক। কোমরে একটা লাল ফিতে জড়ানো। এই মেয়ে যে সূজান তা বুঝে সচকিত হল মোহর। এত পার্টে গেছে মেয়েটা? যেন স্বপ্নসুন্দরী এখন পুথুকের মত দুলে দুলে চলে যাচ্ছে। ওই এগিয়ে আসা, দাঁড়ানো, চারপাশে তাকানো আবার ফিরে যাওয়ার ধরন এত সাজানো যে অবশিষ্ট হচ্ছিল মোহরের। সারলীলতার নিদারুণ অভাব হচ্ছে কেন? দ্বিতীয় মডেলটা এল ঘরমুড়ার ওপর ঢোলা ছোট কামিজ পরে। দর্শকরা হাততালি দিল। তৃতীয়বারে ফিরে এল সূজান। এত দ্রুত সে কিভাবে পোশাক পাল্টা সেটাও বিস্ময়। এখন তার পরনে যে সিঁচি পোশাক তার স্বচ্ছতা বোধহয় ঢাকাই মসলিনেরও হার মানাবে। সূজান সামনে ঠাঁড়িয়ে হাতের আঙুল মুখের সামনে তুলে যেন হুই চাপল। তারপর ধুমাতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে ফিরে গেল। ব্যাপারটা এমন সারলীল হয়ে উঠেছিল যে হাততালির ঝড় উঠল। পোশাকের নিচে স্কিনটাইট আব্রু থাকে সন্তোষ ওর শরীরটাকে বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। সূজান সত্যিকারের সুন্দর একটি শরীরের মালিকনা।

গাড়ির সামনের আসন উপটোকেনে ডরে গেছে। অর্থাগতি ছাড়াও এগুনোর মূল্য কম নয়। পাশে বসে হাত বেলাতে কেলেতে সূজান বলল, 'এগুলো ফেলে দেওয়া যায় না আবার রাখারও জায়গা নেই।'

'কি আছে প্যাকেটগুলোয়?'

'শাড়ি! কসমেটিকস। ভাবছি কোনও মহিলা সমিতিতে দিয়ে দেব। মুশকিল হল এগুলো এত কষ্টলি যে গরিব মেয়েরা পরে না।' নিঃশ্বাস ফেলল সূজান।

কথটা কানে ঢুকল মোহরের। অমনা মুম্বার্কি একবার একটা সস্তা শাড়ি কিনে এনেছিলেন। সেটা দেখামাত্র মা বলেছিলেন, 'একি কিনেছ? এত বাজে শাড়ি কি পরা যায়?' আবার ওর অলমারিতে একটা দু'হাজার টাকার শাড়ি তোলানো আছে। খুব ছোটপাল্টা এক বিয়েরাড়িতে যেন সেটা পরে যেতে দেখেছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলত, কোথাও কি মাছি যে ওই শাড়ি পরব? তাই সূজান হাতের টিকিই বলেছে। যার পরনের শাড়ি দরকার তাকে মহামূল্যবান শাড়ি অথবা দামি কসমেটিকস দিলে সমস্যাও ফেলে দেওয়া হবে।

সূজান বলল, 'কেমন লাগল?'

'ঠিক আছে।'

'তুমি খুব বুঝতে চাইছ না?'

'ঠিক তা নয়। কেমন পুতুল পুতুল লাগছিল মেয়েগুলোকে।'

'পুতুল পুতুল? মাই গড! মিনিমাম পাঁচ পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক একজন। বাম্পের মডেলরা তো আরও বেশি। প্রত্যেকেই বুস স্মার্ট। আর তুমি পুতুল বলছ?'

'আমার কাছে তাই লাগল আর কি বলতে পারি। বড্ড আর্টিফিসিয়াল।'

'হু। তুমি বুঝতে পারছ না। একজন মডেল হল চলন্ত গ্যার্ডরোব। তার কাজ পোশাকটাকে দেখানো, নিজেকে নয়। আমাকেও তাই মনে হয়েছে?'

'দ্বিতীয়বারে এসে যখন হুই তুলে তখন অনারকম লেগেছে। আলাদা।'

খুব হাসল সূজান। তরপার বলল, 'প্রভোকেটিভ পোশাক বলে মনে হয়নি?'

মোহর তাকাল। এখন সূজানের পরনে চমৎকার শালোয়ার কামিজ। মাথা নাড়ল সে, 'আমি তো প্রোভেড হইনি, বলব কি করে?'

'তুমি কেন হবে? তুমি তো মেয়ে। ছেলেদের অনেক হয়েছে। শো-এর পর আটখানা কার্ড পেয়েছি। সবাই আলপ করত চায়। ট্রাস। অশ্লীল লাগেনি তো?'

ভেবে পাচ্ছিল না মোহর। অশ্লীল বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা তার মনে হয়নি। হ্যাঁ, সূজানের শরীরের গড়ন বোঝা যাচ্ছিল। সেই গড়ন সুন্দর। কিন্তু ওর শরীরে চামড়ার রঙের সঙ্গে মেলানো আর একটা পুথুকের স্তর ছিল তাতে সে হচ্ছে হলে না? যদি সেটা না থাকত তাহলে কি অশ্লীল লাগত? সে বলল, 'তোমার এইসব নিয়েই থাকা উচিত। তুমি অনেক বিখ্যাত হবে। অন্যকিছু আর কোনো না।'

সূজান মুখ ঘুরিয়ে নিল। জামলা দিয়ে বাইরে তাকবে থাকল কিছুক্ষণ। তরপার অদ্ভুত পলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আশা করি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হবে না?'

মোহর মাথা নাড়ল, 'না।' কিন্তু চারপাশ টাকা নোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার খারাপ লাগছিল তার। টাকা মুখের এত দরকার হয়—।

রাত্রে বিধানার শুয়ে ওর চোখে কেবলই সূজানই হেঁটে আসার দৃশ্যটি ঘুরে ফিরে আসছিল। সেইসময় সূজানের হাঁটার মাথে যে পোশাদির ভঙ্গি ছিল তাতে আটটি পুরুষ প্রভোবত্ত হয়েছিল। তাহলে পোশাকটা অশ্লীল না হতোও ভঙ্গিটাকে অশ্লীল বলে মনে করা যেতে পারে। একটা বড় হলঘরে অনেক দর্শকের সামনে ওই ভঙ্গি এবং পোশাক মিলে মিশে একটি রমণী-শরীরের প্রতি যাতে আকর্ষণ বাড়ায় এটাই উদ্দেশ্য ছিল ডিজাইনার এবং সূজানের। এবং এটা করার ব্যাপারে সূজানের ব্যক্তিগত কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। সে করেছে পোশাকের কসটিটির প্রয়োজনে। হ্যাং একদম আকস্মিকভাবে মোহরের মনে অন্য একটি ছবি ভেসে উঠল। ইন্ডের সভায় দেবতাদের রোপু দুটির সামনে বেলা নাচছে। সেই নাচ ইন্ডকে খুশি করতো। তাকে নাচতে হয়েছে উর্বরী রক্ত যেনকাদের মূন করতো। স্বপ্নের যৌনকর্ষীদের নীরত শরীর যে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি, মর্তের রক্তমাংসের নারী সেই আকর্ষণ তৈরি করেছিল। কেন করেছিল বেহুলা? না তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞায়। এতে তার ব্যক্তিগত কামনা বাসনা চরিতার্থ করার কোনও আগ্রহ ছিল না ব্যাপারটা অদ্ভুত রকমের হাস্যকর। লক্ষিদরকে দিয়ে আগে কখনও দ্যাবেনি বেহুলা। বিয়ের পরই শুনল তাকে বাসর জেগে থাকতে হবে পাহারা দিয়ে। যে মানুষটিকে আজ স্বামী হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হল তাকে যাতে সাপে না কামড়ায় তা দেখা তার কর্তব্য নইল বাকী জীবনটা বিধবা হয়ে কাটাতে হবে। মানুষটার প্রতি কোনও প্রণয় নয়, নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর সন্তানের প্রথম পর্বে বেহুলা হেরে গিয়েছিল ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে কালঘুম পেয়েছিল বলে বিচারও শুনতে হয়েছিল। তারপর মৃত স্বামীকে জীবিত করে তুলতে তার অভিমান শুরু হয়েছিল। সে-সময় মেয়েদের সতী হবার চল ছিল না। বিধবারাও স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে করতে পারতেন। বেহলারও সেই সুযোগ ছিল। তবু মহিলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে জলে ভেসেছিল।

অনেক বাড়ির পর শেষপর্যন্ত তাকে দেবসভায় পৌঁছে দেবতাদের তুষ্ট করতে নাচতে হয়েছিল। সেই ন্যাস যে শরীরসর্বস্ব নয় তার কোনও প্রমাণ নেই। বরং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। দেবতারা কেউ সূচরিতের অধিকারী ছিলেন না। মেয়েমানুষের শরীরের প্রতি তাদের লোভ মানুষের চেয়ে বেশি ছিল। বেহুলাকেও তাই ক্যাবারে ধরনের নাচ নাচতে হয়েছিল। কেনে নেচেছিল? মানুষ তার প্রেমের জন্যে অনেক কিছু করে। কিন্তু যে স্বাধীকে সে ভাল করে চিনে ওঠেনি, যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হবার সুযোগই আসেনি তার জীবনের জন্যে ওই বাড়িবাড়ি কি শুণু বৈধব্য বাচানোর কারণে। নাকি অনন্তকালের মেয়েলি বোকামো।

ডাবনটাকে কাগজ কলমে লিখতে গিয়ে মোহর দেখল খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না বরং বেশ ভালই লাগছে। মাথার মধ্যে একগাদা ডাবনা এবং সেগুলোকে কলমের ডগা দিয়ে কাগজে ছড়িয়ে দেওয়া যেন চমৎকার একটা খেলা। কোন জায়গাটার ভাল লেখা হল কোনটা হয়নি তা নিজেই বুঝতে পারছিল সে। মন্দ লেখাকে ভাল করার চেষ্টা চলছিল সমানে।

দ্বিতীয় দিনে লেখাটা শেষ হল। মোহরের তখন দারুণ উত্তেজনা। ইচ্ছে হচ্ছিল কফি হাউসের বন্ধুদের কাছে ছুটে গিয়ে লেখাটা পড়তে শোনতে। আবার সেটা করতে তার এক ধরনের লজ্জাও হচ্ছিল। এটা ঠিক মেয়েলি লজ্জা নয়, বরোনা মুশকিল। সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে সৌমিককে মোহর খুব উদাসীন গলায় বলল, 'আমি একটা লেখা লিখেছি। গদ্যরচনা।'

'রচনা যানে? স্কুলে যা লিখতাম?'

'দূর। এটা ঠিক প্রবন্ধ নয়, রম্যরচনা ধরনের।'

'অ।'

'শুনবি?'

'কত বড়?'

'আট পাতা। ফুলস্কাপের।'

'ওরে স্বাস। দশ বারো লাইনের কবিতা শোনা যায়। তুই কবিতা শোনা, শুনবি?'

খুব রাগ হয়ে গেল মোহরের। দুদিন সে কবিতাউপে গেল না। কলেজ শেষ হলে লাইব্রেরিতে, সেখান থেকে বাড়ি। লেখাটার কথা তখনভাবে মনে থাকল না ওর।

প্রথম বছরটা কলকাতায় নিরিবাসে কেটেছিল। গোলকপতি ব্যানার্জি তার ব্যবহারে যে অসন্তুষ্ট হননি সেটা বোঝা যাচ্ছিল। ছুটিছটিয় সে যখন হরদ্বারে যায় তখন অঙ্গুলারের মুখভঙ্গি বলে মনে, না পালেই ভাল হয়। কলেজ থেকে কোরার সময় অঙ্গুলারকে বৈঠকখানার ঘরে বসে থাকতে দ্যাখে মোহর। তরুণর সারারাতের মধ্যে কোনও মিথগন্ধ নেই। ওর ছেলেদের সম্পর্কে যে সম্বন্ধানবাণী সে শুনেছিল তার সঙ্গে বাবরের কোনও মিল হয়নি। এই এক বছরে তারা কখনওই মোহরের কাছে আসেনি। পথঘাটেও কেউ কথা বলেনি।

কলেজে উৎসব ছিল। সকালে-বেকুরার সময় বলে গিয়েছিল মোহর। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। এসে দেখল দরজা বন্ধ। কাজের লোকটার নাম ঘরে ডাকাডাকি করে পান সাড়া মিলল। লোকটা দরজা খুলে বিড়বিড় করল, 'এত রাত হল? বড়বাণু খুব রাগ করছেন।'

'আমি তো থেকে বলে গিয়েছিলাম।'

'ভাই নাকি। কি জানি বাবা।'

মোহরের মনে হল প্রতিবাদ করা দরকার। আজ সকালে গোলকপতিবাবুকে রাত হতে পারে কল্যাণ তিনি ইন্টিমেয়ার বসে মাথা নেড়েছেন। তাহলে এখন রাগারাগি করবেন কেন?

বাবুলা দিয়ে এগিয়ে সে বৈঠকখানা ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভেতরের আলো জ্বলছে কিন্তু গোলকপতি সেখানে নেই। সে ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকাতো আর একটা দরজা দেখতে পেল। সেই ঘরে কথা বলছে কেউ। সেদিকে এগোতেই কাজের লোকটা পেছন থেকে হ্যাঁ হা করে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করতে লাগল চলে যাওয়ার জন্যে।

লোকটার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হল মোহর। গভীর মুখে বলল, 'ওর সঙ্গে কথা বলব?'

লোকটা কিসকিস করে বলল, 'এখন না, কাল সকালে। এখন নিজের ঘরে যাও।'

'কেন? এখন কি অসুবিধে?'

'এখন বাবু মানুষ নেই। ওসব তুমি বুঝবে না। যাও, কাল সকালে বোলা।'

প্রায় জোর করেই তাকে বাইরে বের করছিল লোকটা ওইসময় ভেতর থেকে গোলকপতির বাড়িই গলা ভেসে এল, 'কোন শালা এখানে?'

'আজ্ঞে কর্তা, আমি।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিল হতভাগা?'

'আজ্ঞে, মানে, বেড়াল। বেড়াল ঢুকছিল।'

'তাড়িয়েছিস?'

'হ্যাঁ। লোকটা জবাব দিচ্ছে আর ইশারা করছে চলে যেতে।'

'অম্মদার মেয়ে ফিরেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা। অনেক আগে ফিরেছেন।'

বারদায় চলে এসেছিল ওয়া। অতএব নিজের ঘরে ফিরে এল মোহর? এখন বাবু মানুষ নেই যার কি? অমানুষের কাজ ওই বৃদ্ধ কিভাবে করবেন? তার মনে হচ্ছিল কাজের লোকটা নটিক করল। অশ্য গোলকপতির গলার স্বর এখন অনবরক লাগছিল।

খাওয়াপাওয়া করার পর আলো নিভিয়ে শুতে গিয়ে মোহরের মনে হল একবার নীচে নেমে দেখলে হয়। সেদিন অনিদ্রা বলছিল উত্তর কলকাতার কিছু মানুষ এখন তন্ত্র শ্রোত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা আত্মা চালান করা যায়। কাউকে ভয় দেখাতে পোষা আত্মাকে পাঠানো যায়। এই এলাকার মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত অনেক তান্ত্রিক নাকি ওই করে ধনবান হচ্ছেন। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়িগুলোতে এখনও কিছু প্রাচীন মানুষ ওই বিশ্বাস নিয়ে বাস করছেন। দক্ষিণ কলকাতায় এদের দেখা যাবে না। সেখানে আবার খিলানো গুরুবাদের বাড়িবাড়ি। মোহরের মনে হল গোলকপতি কি সেসকল কিছুর সঙ্গে জড়িত? যে মানুষটা দিনভর গভীর নিয়ে ইন্টিমেয়ার বসে থাকেন তিনি রাতে কিভাবে অমানুষ হয়ে যাবেন? কৌতুহল বাড়ছিল। নিশ্চন্দ্রে নীচে নামল সে।

বারদায় পা রাখতেই গলা পেল, 'এখন ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, যাও।'

'বললাম একটা রিক্সা ডেকে দাও, বাড়ি চলে যাই।' গলাটা মেয়েদের।

'না। সন্তোষনা হলে সেটা দিতাম। মাঝরাাত্র এ বাড়ি থেকে রিক্সা উঠলে বাবুর মান থাকবে? শুয়ে পড়, ভোর ভোর ডেকে দেব। যাও।'

মোহর দেখল একটা স্ত্রীলোক বারদা দিয়ে কোণের ঘরে চলে গেল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে কাজের লোকটা বৈঠকখানা ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। এখন বাড়ি সুশাসন। কোথাও কোনও শব্দ নেই। স্ত্রীলোকটি যে ঘরে ঢুকল সেখানে সেই বৃদ্ধা রাতে থাকে। মোহর ভেবে পাচ্ছিল না স্ত্রীলোকটি এতশুণ গোলকপতির ঘরে কি করছিল। স্ত্রীলোকটির পরিচয়ই বা কি। কৌতুহল তাকে নিশ্চন্দ্রে ছোট ঘরের দরজার পাশে নিয়ে এল। এখানে কোনও আড়াল নেই। যদিও বারদার আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা জ্বালালেই সে ধরা পড়ে যাবে।

ঘরের ভেতর স্ত্রীলোকটি গজগজ করছিল, 'আলো জ্বালা যাবে না, পেট্রি হয়ে থাকতে হবে।'

'দুশ কর। ঘুমতে দে।' বৃদ্ধার গলা।

'ঘুমিয়ে মর। তোমার তো কিছু করার নেই ঘুম হাড়া। এমন কিছু রাত হয়নি, আমি ঠিক চলে যেতে পারতাম।' স্ত্রীলোকটি রেগে গিয়েছিল।

‘কেন? এখানে শুনে কি পিপড়ে কামড়াবে?’

‘আমি আর আসব না। এর পরের বার অন্য লোক এনো তোমরা?’

‘ইস! আসবে না। ফোকটে টাকা পাচ্ছে মাগি, আবার কথা!’

‘ফোকটে? টিপতে টিপতে হাত বাখা হয়ে যায় তবু বুড়ার ব্যথা মরে না!’

‘মাসে চারদিন মাত্র। দুই একাদশী পূর্ণিমে আর অমাবস্যা। কণ্ঠের ব্যথা বাড়ে বলে তো তাকে ডাকা। তার জন্যে হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছিল। আমাদের বৌবনে কেউ দিত অত টাকা? সারাজীবন তো কিগিরি করে গেলার। লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ হাত বাড়ালেও মুঠো খুলত না। তোমাদের দেখলে হিঁসে হয়।’ বুড়ির গলায় ঝঁঝ।

‘হিঁসে হয়। টিপে দ্যাখো না ওই ঘাটের মড়াকে। শরীর তো নয় ঝড়ের লাস। তার ওপর মদ গিলে সোজা টং। চাপ কমাচ্ছেই খিন্তি করে। হ্যাঁ, মুরাদ যদি থাকত তাহলে আমারও মজা হত। তা মুরাদ চলে গেছে বিশ বছর আগে অথচ হাতের সুখ করতে ছাড়ে না। আমি কি মানুষ নই?’

‘তাহলে কাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিবি?’

‘দেখি!’

‘মাস গেলে হাজার টাকার পাস, তোর ভাতার ছেড়ে কথা বলবে?’

‘বলে দেব। বুড়াকে ম্যাসেজ করি এটুকুই জানে, বুড়া যে হাত বেলায় তা তো জানে না।

জানলে কবুকের করবে। আজ রাতের ডিউটিতে গিয়েছে বলে তবু বাঁচায়।’

‘মাথ ঠাণ্ডা করে ঘুমিয়ে পড়। বুড়া মানুষ শিশুর মত। তাই ভেবে নে।’

‘শিশুর মত। দাঁত নেই একটাও তবু মাড়িতে কি জোর, যেন রাক্ষস!’

মোহর সরে এল। বৈঠকখানায় বস্তু ঘরের দিকে তাকাল। গোলকপতি ব্যানার্জির গম্ভীর মুখটা মনে পড়ল। কে বলবে-ওই বৃদ্ধ নির্জন বাড়িতে মাসের চাররাত এইভাবে সুখ ভোগ করেন! কোথায় যেন সে পড়েছিল পুরুষমানুষের লালসা চিত্তার আগুন ছাড়া শেষ হয় না। এই কারণেই ঠুর নিজেরা এই বাড়িছাড়া হয়েছে!

নিজের ঘরে করে এলো সে। একটি বছর এ বাড়িতে থেকেও সে এগুনের বিন্দুবিসর্গ জানত না। জানার পর নিজেকে আর নিরাপদ বলে মনে ছিল না। গোলকপতি কি তার ওপরেও অত্যাচার করেন? মাথা নাড়ল সে। না, সেটা করেন না। করলে বেদম মার থাকেন। তাছাড়া কলেজটারি ভয় বুড়াদের বেশি থাকে। ওই স্ট্রীলাকটিকে সে প্রথমে বারবনিতা বলে ভেবেছিল। পরে বুঝতে পারল ওরও স্বামী সঙ্গার আছে। ম্যাসেজ করে। সেটা করতে গিয়ে টাকার লোভ প্রকাশ দেয়। কিন্তু এ বাড়ির কাজের লোক এবং ওই বৃদ্ধা এসব বর্ননা জানে অথচ কখনও মুখ খোলেন না। মোহরের মনে হল এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। হোস্টেলে চলে যেতেই হবে তাকে।

পরদিন সকালে কলেজে যাওয়ার সময় মোহর ভেবেছিল বৈঠকখানা ঘরের দিকে তাকাবে না। কিন্তু গোলকপতির গলা কানে এল, ‘দিদিমণি!’

সে দাঁড়াল। কিন্তু মুখ ফেরাল না।

‘কাল রাত হয়েছিল কিরতে?’

‘হ্যাঁ। আমি আপনাকে বলে গিয়েছিলাম।’

‘তা গিয়েছিলে। বছরে এক আধদিন দেরি হতেই পারে। কিন্তু শহরটার নাম কলকাতা।

রাতের বেলায় এখানে মেয়েছেলে একা নিরাপদ নয়।’

‘বাড়ির ভেতরেরও যে নিরাপদ থাকে তাও নয়। তাছাড়া আমি মেয়েছেলে নই। আমি একটা

মেয়ে কিন্তু মানুষ।’

‘অ। মেয়েমানুষ বললে ক্ষতি নেই।’

‘পুরুষমানুষ বললে মেয়েমানুষ বলা যায়। তবে হয়ে করে নয়।’

হাসলেন গোলকপতি। হাসতে হাসতে বললেন, ‘অমদা লিখেছিল তোমার মধ্যে তেজ আছে। তা দেখছি আছে। তোমাকে আমি খুব স্নেহ করি দিদিমণি। তাই বিপদের কথা মনে আসে। যাও।’

অত্যন্ত ভাল ব্যবহার। হাঁটতে হাঁটতে মোহর ভেবে পাচ্ছিল না এই মানুষটা রাতের বেলায় কি করে মানুষ ছিলেন না। মানুষের অনেকগুলো চেহারা আছে? এক একজনের সঙ্গে সে এক এক চেহারায়ে মেলানোশ করে। প্রাশনশকে পুলিশ জেলে পাঠিয়েছে যেসব চাফে তার সবগুলোই হয়তো সত্যি। কিন্তু তার সঙ্গে প্রাশনশ যে ব্যবহার করত তা অন্যকেই বিশ্বাস করবে না। সেটাও তো সত্যি ছিল। তাই আমি গোলকপতি ব্যানার্জিকে যে চেহারায়ে দেখছি তার বাইরে উনি কি মানুষ তা জানার দরকার নেই।

কলেজ ট্রিটের মোড়ে খুলন্ত অবস্থা থেকে বাস থেকে যে লোকটা নেমে তার দিকে তাকিয়ে হাসল সেই লোকটিকে অনেকদিন দ্যাখিনি মোহর। দেখে ভাল লাগল।

‘আপনি বাসে খুলে যাচ্ছেন?’

‘এই সময় ওটা কি খুব অস্বাভাবিক?’

‘সামরপ মানুষ যা করে তা আপনাকে মানায় না।’

‘আমার অপরাধ?’

‘আপনি কবিতা লেখেন। আমি চেষ্টা করব ওটা পারিনি।’

‘বাঙালি কবিতা লিখে পেট ভরাতে পারে না। একটা সুখের দিচ্ছি। আমি চাকরি পেয়েছি। দীপ্ত হ্যাল।’

‘সত্যি। কনগ্র্যাচুলেশন।’

‘হাইনেটা খারাপ না। তিন হাজারের একটু বেশি। প্রাইভেট ফার্মে। সেখানেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ায় নেমে পড়লাম।’

‘এভাবে নামলে চাকরি থাকবে?’

‘নামার সময় ভাবিনি।’ দীপ্ত রাস্তার দিকে তাকাল, ‘চাকরি করা দরকার কারণ তাহলে মাস পাঁচেকের মধ্যে কবিতার বই বের করতে পারব।’

‘আর একটা বই বাস আসছিল। মোহর হাসল, ‘উঠে পড়ুন।’

সেখা গেল বাসটির হাতল ধরার জায়গাও নেই। সেদিকে তাকিয়ে দীপ্ত বলল, ‘আচ্ছা, আজ যদি আমার খুব জ্বর আসত তাহলে নিশ্চয়ই অফিসে যেতাম না।’

‘তা তো ঠিকই।’

‘তাহলে ধরে নিই আমার জ্বর হয়েছে। সারাদিন আড্ডা মারা যাক।’

‘আমার যে ক্লাস আছে।’

‘ভুব দিলে তবে বোঝা যাবে ক্লাস ছিল।’

‘কোথায় যাবেন?’

‘কেন? কফিহাউস। প্রায় বিনা পয়সায় সময় কাটানোর এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় পাব। দীপ্ত হাঁটা শুরু করল।

‘অনিদ্রার ডাকব?’

‘ওরা তো সময় হলে আসবেই। আমার সব কি খুব খারাপ লাগবে?’

কি থেকে কি হয়ে গেল, কেন হল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই কিন্তু ব্যাপারটা চুপচাপ ঘটে গেল। সারাক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে থাকা, জ্বরেজ্বরে ভাব, নিজের জন্যে এক অদ্ভুত আরাধনা নিজেই তৈরি করা। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে

'কলেজে আমাকে শুনিযে কয়েকজন আবৃত্তি করেছে।'

'ওরা আমার কথা বলছে।'

'না। আমাদের যা নিজস্ব তা বারোয়ারি করবে না।'

দীপ্ত কিছুক্ষণ চুপে থাকল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'তুমি আমার নিজস্ব কবে হবে?'

'আগে চাকরি করি। তারপর।'

'সে তো অনেক দেরি।'

'হোক। আমরা তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না।' হেসেছিল মোহর।

ইদানিং মোহর একটা জিনিস বেশ টের পাচ্ছে। তার ভেতরটা যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন মনে হত কেউ তাকে মেয়ে বললে যেন হেয় করেই কথা বলছে। মেয়ে, মেয়েহলে শব্দগুলো পুরুষজ্ঞাতটা নিজের প্রতীপত্তি তৈরি করার সুবাদেই ব্যবহার করে। প্রতিবাদ করার জন্যে উন্মুখ থাকত তখন। এখনও সেই মানসিকতা একেবারে যায়নি তবু একেই যে দু-লল মানুষকে দূরকভাবে তৈরি করেছে সেটা যেন নিতে পারছে। এই যেন নেওয়া মানে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করা নয়। মেয়েদের স্বাধীন অস্তিত্বকে যে পুরুষ স্বীকার করবে না তার সঙ্গে কোনও সহযোগিতায় যেতে সে রাজি নয়।

মাঝে মাঝে মোহরের মনে হয় এই অবস্থার জন্যে মেয়েরাই দায়ী। দুজন তিরিশ পার হওয়া মহিলারা একত্রিত হলে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তা পুরুষরা কখনওই করে না। শাবিত, ছেলেমেয়ে, কর্তার খেয়াল অথবা গয়নার প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলায় কি সুখ যে সেইসব নারীরা পান তা বুঝে উঠতে পারেনি মোহর। কেবলই মনে হয় চিত্তার সীমাবদ্ধতার কারণে বঙ্গনারীরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। এবং এইসব আলোচনার পর অবশ্যই আসবে অন্যের আচরণ সম্পর্কে আপত্তি জানানো। কোনও স্বাবলম্বী মহিলাকে স্বামী-নির্ভর রমণী ইহার কারণে সহ্য করতে পারে না। আর এই স্বর্গের শরিক হিসেবে সে আলোচনার সঙ্গিনীকে পেতে চায়। এইসব নারীরা মনে করে পুরুষজ্ঞাতটা শুধু তাদের শরীরবিজ্ঞ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। ফলে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সব ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়া বঙ্গনারীর পক্ষে এত বছরেও সম্ভব হল না।

দীপ্তর দিকে তাকালে মোহরের মন ভাল হয়ে যায়। অদ্ভুত এক জ্যোতি যেন ওর মুখে খেলা করে সবসময়। কফিহাউসে অন্য মেয়েরা দিদি দীপ্তর সঙ্গে কথা বলে তাহলে একটুও ভাল লাগে না মোহরের। এটায় বোধহয় প্রাকৃতিক নিয়ম। দীপ্তার পিতামাতা সন্তানকে আমার মত সবাই ভালবাসুক, না ভালবাসলে আমার খারাপ লাগে। কিন্তু আমি ছাড়া কেউ যেন আমার রক্তের সম্পর্কবিহীন দ্বিগুণ পুরুষ অথবা নারীকে না ভালবাসে। বাসলে আমি সহ্য করব না।

অর্থাৎ দীপ্ত সাদালাপটা বড়ালি নয় যে আলসেদ্ধ ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একটা পত্রিকা ঘিরে গোষ্ঠী তৈরি করেছে ওরা। বোহেমিয়ান হবার চেষ্টায় তারা যা করে বেড়ায় তা নিয়ে আলোচনা করে তরলতরল। কেউ কেউ বলে নিয়মভাঙার বেপারোয়ারি ওরা নিজেদেরই ভেঙে ফেলছে। খালাসিটোলায় মদ গিলতে যখন ওরা যায় তখন দীপ্তও সঙ্গী হয়ে মাঝে মাঝে। এ ব্যাপারে এখনও কোনও কথা বলেনি মোহর। একদিন দীপ্ত এক বিখ্যাত কবির কথা বলছিল। আগের রাতে মদ্যপান করার পর পার্কে বসে তিনি চম্পা হারিয়ে ফেলেছিলেন। চম্পার অভাবে প্রায় আন্ধ সেই কি বুড়ো হয়ে হাতডে হাতডে পার্কের ধানে চম্পা খুঁজতে খুঁজতে তিরিকার করে উঠেছিল, 'আমি আর কতকাল এভাবে ইজ্বর?' রাতে বাড়ি ফিরে দীপ্তর মাথায় নতুন লাইন এসেছিল কিন্তু সকালবেলায় সেটা একদম ভুলে গিয়েছে। মোহর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'লিখে রাখোনি কেন?'

দীপ্ত মাথা নেড়েছিল, 'তখন কলম ধরতে পারতাম না।'

'এত মদ খেয়েছিলে?' বিরক্ত হয়েছিল মোহর।

'আসলে নেশা করার জন্যে বাইনি। ঝাওয়ার ঘোরে খেয়ে ফেললাম নেশা হয়ে গিয়েছে।'

'মদ খেতে ভাল লাগে?'

'মদ লাগলে যেতাম না।'

'আমাকে খাওয়াবে?'

দীপ্ত মোহরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'মুশকিলে ফেললে।'

'কি রকম?'

'আমরা খাইই সম্ভার মদ। প্রথম খেলে সেটা অখাদ্য মনে হবে। দ্বিতীয়ত খালসিটোলায় গিয়ে

তুমি মদ খাচ্ছে এদৃশ্য অনেকের সহ্য হবে না। ওখানে কোনও মহিলাকে মদ খেতে দেখিনি।

এখনও পাবলিক প্লেসে যেসব মহিলা মদ্যপান করেন তাঁদের লোকে কুনজুর দেখে।'

'পাবলিক প্লেস বলতে?'

'যেমন জায়গায় পাবলিক অন্যায়সে যেতে পারে। কিন্তু ফাইভস্টার হোটেলগুলোতে অথবা

নামী ক্লাবে যেসব মহিলা মদ্যপান করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা বলতে কারও আপত্তি নেই।'

'কিন্তু আমি একদিন মদ খাব।'

হেসে ফেলল দীপ্ত। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আজই চলে।'

'কোথায়?'

'সম্ভালেকে। সৌমেনদার বাড়িতে। সৌমেনদা বাড়িতেই খায়। বিদেশি মদ।'

'এখন ছুটা বাজছে। ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?'

'নটা।'

'মোহরের হঠাৎই জেদ চেপে গেল। অফিস ছুটির পর এই সময়ে কলেজ ট্রিট থেকে বাস ধরা মুশকিল। দীপ্ত অনেক চেষ্টার পর একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ট্যাক্সিতে উঠেই মোহর বলল, 'আগে মুক্তরাবাবু ট্রিট হতে।'

'কেন?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানকার নিয়মটা আমাকে মানতেই হয়। দেরি হবে একধা জানিয়ে যাব।' হাসল মোহর।

বিরক্ত হল দীপ্ত। ট্যাক্সির তাড়া বাড়ানোর ইচ্ছা তার ছিল না।

মুক্তরাবাবু ট্রিট এসে মোহর দেখল গোলকপতি বানার্জির বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো ভিড় জমেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা যেতেই একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পরিচয়?'

মোহর মুখ তুলে লোকটিকে চিনতে পারল না। লম্বা চওড়া চোখরা, পাছমা পাছাঘি পরা মানুষটাকে চেনাও হতো।

মোহর জবাব দিল, 'আমি এ বাড়িতে থাকি?'

'ও, তুমি অন্নদাদার মেয়ে? তোমার কথা আমি শুনেছি।'

'আপনি?'

'আমি? গোলকপতি বানার্জির বাড়ি ছেলে। তাঁর ককুম ছিল জীবদ্দশায় যেন এবাড়িতে না ঢুকি। কিন্তু আজ উনি দেহ রাখতে আমাকে আসতে হল।' অস্বস্তিক গম্ভীর মুখে বললেন।

'মানে? উনি নেই?'

'হামকে উঠল মোহর।'

'না। বারোটো নাগাদ সম্ভানে চলে গিয়েছেন। খবর পেয়ে আমি এসেছি। আমার ছোট ভাইয়ের

আসার জন্যে অপেক্ষা করছি। ও এলে সম্ভানে যাব।'

বিশ্বাস করতে পারছিল না মোহর। গোলকপতিকে আজ সকালেও সে দেখেছে বলে থাকতে।

কথা হয়নি। এমন তো অনেকদিনই হয়। লোকটাকে সে সমর্থন করতে না যেমন, তেমন ব্যক্তিগত

কোনও আপত্তি ছিল না। তার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করতেন গোলকপতি। সেই মানুষটি এমন হুঁট করে ঘরে গেলেন। পায়ে পায়ে বৈঠকখানা ঘরে গৌছে সে গোলকপতিকে দেখতে গেল। ইজিচেয়ারেই শুয়ে আছেন। অর্থাৎ ওখানেই মারা যাওয়ার পর আর তাঁর দেহকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে বসে সেই বৃদ্ধা অশক্ত একদা কাজের লোক গুনগুন করে কাঁদছে। ঘরে আরও কয়েকজন মানুষ, যাদের মোহর চেনে না। মোহর গোলকপতির মুখের দিকে তাকাল। মনে হচ্ছে ঘুমিয়েছেন। একাদশী পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতে ওর শরীরে ব্যথা হত। আর হবে না। সেই ব্যথার নিরসন করানোর অছিলায় উনি টাকা দিয়ে মহিলা ম্যাসেজারকে রেখেছিলেন যার শরীরে হাত বোলাতে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি খুব তৎপর ছিলেন। আর সেটা ব্যর্থনেন না। যে মেয়েটি কাজটা ছেড়ে দেবার হুমকি দিয়েছিল সে বেচারী জ্ঞানত না এটা তড়াতাড়ি এ বাড়িতে আসার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। হাজার টাকা আয় বন্ধ হয়ে গেল তার।

এখন কি করা যায়? বাড়িতে কেউ মারা গেলে যে শোকের পরিবেশ তৈরি হয় একমাত্র ওই বৃদ্ধার গুণগুণানী ছাড়া সেটা এখানে নেই। সবাই অপেক্ষা করছে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য এবং সে এলেই দায়মুক্ত হবে। আজ সকালেও যার দাপটে কেউ কাছে ঝঁসত না এখন তাঁকে কেউ পরোয়াই করছে না।

দীপু ট্যান্ডিতে বসে আছে। ওকে ব্যাপারটা বলা দরকার। গোলকপতি তার আশ্রয়দাতা। কলকাতায় বাসস্থান জোগাড় করার যে তীব্র সমস্যা তা ভদ্রলোকের জন্যে তার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়নি। এই কৃতজ্ঞতায় তার এখন মৃত্যুদেহের কাছে থাকা উচিত। মোহর এগিয়ে যেতেই গোলকপতির বড় ছেলেকে বলতে শুনল, 'এ বাড়িতে থাকবে কে? বিক্রি করে দে। যেক্ষর মত আগলে ছিল বলে এতদিন পারিনি। ছোটটা যে কেন এত দেরি করছে।'

ওর কথা শেষ না হতেই একটি মানুষ ঢুকল। সবাই তাকে দেখে যেন স্থব্রি গেল। লোকটা বলল, 'তুই দেখছি আগেই এসে গেছিস। ভাল। বড়ি কোথায়?'

'বৈঠকখানায়রে। তোর দেরি হল?'

'একবারে গাড়ি নিয়ে চলে এলাম। ক্যান কিছু রেখেছে?'

'আমি দেখিনি।'

'আমাকে ধর ডাবিস না। আগে এসে তুই হাতভাসনি এটা হতেই পারে না। যা ফোক পরে হিসেস হবে। আগে বড়ি গাড়িতে তোল। শশানের খবরটা ওখান থেকে করবি। আমি কোনও কামেক্ষা যেতে চাই না।' ছোট বলল।

'তুই মাল খেয়ে এসেছিস?'

'কালও বাবার পরস্যা খাইনি। রোজই খাই আজ যে বাপ ছবি হবে তা কি করে জানব? চল।' ছেলে এগিয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হিন্দু সৎকার সমিতির ট্রচারে শুয়ে গোলকপতি কাচের গাড়িতে শুয়ে পড়লেন। কয়েকজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুই ছেলে শশানের দিকে চলে গেল। মোহরের হঠাৎ খোয়াল হল কাজের লোকটিকে সে দেখতে পায়নি। গোলকপতির শব্দেব মানুষটা গেল কোথায়? খোলা বাড়ির সামনে থেকে পাড়ার ভিড় সরে গেল মোহরের সঙ্গে হল বাড়ির রোহা বলা দিচ্ছে ওর প্রতি কারও মন নেই।

ট্যান্ডির সামনে দাঁড়িয়ে অর্ধেক দীপু সিগারেট বাজিল। ইতিমধ্যে সে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গেছে। মোহর তার কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবে?'

'বৃদ্ধকে পারছি না।'

'ভেবে দ্যাখো। মিটার উঠছে।'

'ওরা আমাকে শশানে যেতেও বলল না।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'তোমর কেউ নেই। একজন বৃদ্ধা কাজের লোক।'

'তাকে বলে এসো আজ রাতে তুমি বাইরে থাকবে।'

'বাইরে কেন?'

'আশ্চর্য! একটা মানুষ মারা গেল যে বাড়িতে সেখানে তুমি সারারাত একা থাকবে? কেউ থাকে? যাও।' দীপু জোর গলায় বলল।

'খানিকটা পরে ট্যান্ডিতে বসে মোহর বলল, 'লোকটা চলে গেল।'

'সবাই তাই যাব।' দীপু বলল, 'তোমার আত্মীয় তো নয়।'

'দুঃসম্পর্কের।'

'ওর ছেলেমেয়েরা এসেছে?'

'হ্যাঁ। তারা এখনই আন্তিন পোস্টাচ্ছে।'

'বাঃ। তোমাকে থাকতে দেবে?'

'বৃদ্ধকে পারছি না। বড় ভাই তো চিনতে পারল।' মোহর মাথা নাড়ল, 'বলে তো এলাম, রাতে কোথায় থাকবে?'

'চলো, দ্যাখা যাক।'

'সন্টলকে সৌমেনদা বলে যে ভদ্রলোকটির কাছে দীপু তাকে নিয়ে এল তিনি বেশ সচ্ছল মানুষ। তাঁর স্ত্রীও সুন্দরী। দীপুকে দেখে তিনি খুব উচ্ছসিত, 'ওমা। তুমি। কি ভাল।'

দীপু বলল, 'বউদি, আমায় সঙ্গে যে আছে তাকে দেখুন।'

'দেখছি। এসো ভাই। কি নাম তোমার?'

'মোহর মুখাঙ্গি।'

'বাঃ। বোসো।'

সৌমেনবাংকে ভাল লাগল মোহরের। খুবই মজ্জিত কথাবার্তা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সহজে কথা বলতে পারেন। মোহর দেখল দীপু তার বউদিকে সাহায্য করতে ভেতরে চলে গেল। এর মধ্যে সে জানিয়ে দিয়েছে গোলকপতির মৃত্যুর কারণে মোহরের মনের অবস্থার কথা। সৌমেন বললেন, 'যে কোনও মৃত্যুসংবাদই দুঃসংবাদ। মানুষটা খারাপ হলেও মৃত্যুর খবর শুনলে বিষাদ আসবেই। তুমি সজ্ঞ হবার চেষ্টা করো মোহর।'

একটু বাসেই টেবিলে জল বরফ এবং খাবার চলে এল। সেইসঙ্গে সুন্দর দেখতে একটি মদের বোতল। দীপু বলল, 'সৌমেনদা, মোহর কোনওদিন ড্রিন্ক করেনি। আজই প্রথমে করবে। সুতরাং আমাদের উচিত হাততালি দেওয়া।'

বউদি বললেন, 'না ভাই। ওদের কথা শুনে না। মদ না খেলে যেমনসাহেব হওয়া যায় না বলে একদম বিশ্বাস করো না। আমি খাই তোমার দাদার পান্নায় পড়ে। উনি ক্লাবে কম যান, হোটলে যাবেন না, বাড়িতে বসে একাও যাবেন না তাই সঙ্গ দিতে দিতে এই দশ।'

মোহরের খারাপ লাগল। নিজের জন্যে সাফাই গাওয়ার কি দরকার ছিল ওর। গ্রাসে ঢালা পানীয়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, না খেলেই ভাল হয়। গোলকপতির মৃত্যুসংবাদ শোনার পর শরীফটা কি রকম অশান্তিতে রয়েছে। প্রিয়জন না হলেও আশ্রয়দাতার মৃত্যুর দিনে এই হাতবুড়ির কি দরকার!

'নাও।' দীপু বলল।

বাড়িয়ে ধরা সোনালি রঙের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মোহর, 'না।'

'কেন? নার্ভাস হয়ে গেলে? বউদি, দ্যাখো তোমার কথায় কেমন যাবতে গিয়েছে।'

দীপ্ত শব্দ করে হেসে উঠতেই রাগ হয়ে গেল মোহরের। সে গ্লাসটা নিল। আজ পর্যন্ত কারও খোঁচা মুখ বুঝে সহ্য করেনি যদি নিজের কোনও গলদ না থাকে। গোলকপতির হঠাৎ এমনভাবে মরে যাওয়ার পর তার কিছুই ভাল লাগছিল না অথচ দীপ্ত সেটা বুঝতে না পেরে ব্যঙ্গ করছে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে মোহর জিজ্ঞাসা করল, “সরবত্তর মত একবারে খেয়ে নেব?”

সৌমেনদা হাত তুললেন, “কক্ষনো না। একটি চুমুক দাও, কেমন লাগছে দ্যাখো, ভাল না লাগলে খেয়ো না। দীপ্ত যাই বলুক কান দেবে না।”

মোহর মদ্যপান করল। জিত জালিয়ে তরল আগুন গলা পুড়িয়ে পেটে যায় বলে যেসব বর্ণনা সে এককাল পড়েছিল তার সঙ্গে কোনও মিলই খুঁজে পেল না। খুব মোলায়েম একটা ডিক্টেড স্বাদ, সঙ্গে বিস্কুটের গন্ধ, একটি গরম অনুভূতি ছড়াল মুখে, এইমাত্র। সেটা বলতেই দীপ্ত জোরে হেসে উঠল, “ক্রিমিয়াম খেলে, তায় বিদেশি। দিশি হলে সিলতে পারত না।”

‘গোলা কেন?’

‘এই প্রেমের উত্তর মদ তৈরির কারখানাগুলো দিলেও দিতে পারে কিন্তু পৃথিবীর কোনও মদ্যপানীয়া বা বলবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যা হোক, তোমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। দীক্ষা দিয়ে দিলাম আমরা। এখন যদি খেতে না চাও তো গ্লাসটা এদিকে বাড়িয়ে দাও।’

‘সেকি? এটো খাবে?’

‘মদের আর এক নাম সুরা। এটো হয় না।’

বউদি বাধা দিলেন, “আশ্চর্য! ওকে গ্লাস দিয়েই সরিয়ে নিচ্ছ। আগে দ্যাখো ও আর যায় কি না। তুমি কোথায় থাকো ভাই।”

‘হলদপুরে।’

‘হলদপুর! সেটা কোথায়?’

গল্প জম্মে গেল। আর গল্প করার নেশায় প্রথম গ্লাসটা খেয়ে ফেলল মোহর। প্রথম প্রথম খারাপ লাগছিল কিন্তু পরের দিকে সে ভাবটা চলে গেল। দীপ্ত তাকে দ্বিতীয় গ্লাস দিল। রাত হচ্ছিল। সৌমেনদা বউদিকে খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। এদের বাড়িতে তিনখানা শোওয়ার ঘর। ঠিক হল বউদি আর মোহর আজ রাতে একসঙ্গে শোবে। সৌমেনদা তার ঘরে, অন্যটিতে দীপ্ত। রাত বেড়ে যাওয়ায় তার আর ফেরার দরকার নেই।

টেবিলে বসে খেতে গিয়ে মোহর ব্যস্ত খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই হচ্ছে না। জিত বেশ ভারী এবং স্বাদময় হয়ে গেছে। সে নাড়াচাড়া করে বউদিকে বলল, ‘খেতে ইচ্ছে করছে না।’

সৌমেনদা বললেন, ‘জোর করো না।’

শোওয়ার আগে বউদি একটা ম্যাসি বের করে দিলেন, ‘প্যান্ট সার্ট পরে নিচ্ছয়ই ধুমাবে না। কিঙ্গা, তোমার নেশা হয়ে গেছে নাকি?’

মোহর হাসল, কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে চেঞ্জ করার সময় বুঝতে পারল তার হাত-পা মাথার হকুম ঠিকঠাক মালছে না। ম্যাসির হাতটা পেতে একটি ঝবেলা হল।

ঘুরে পড়ল সে আগেই। পেটের ডেভরটা গোলাচ্ছে। বমি করলে ভাল লাগত। কিন্তু সেটা করতে গেলে যে আওয়াজ হবে তা দীপ্তর কানে পৌঁছাবেই। আবার ব্যঙ্গের হাসি হাসবে সে। তাই প্রাণপশে নিজেকে ঠিক করতে চাইল মোহর। সৌমেনদা খুব ভঙ্গলোক। এদের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। ভুলনায় বউদির মধ্যে ন্যাকাপনা যেন অনেক বেশি। দীপ্তর সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আবেগে গলছেন। সে একটা বিমূর্নি টের পেল।

কেউ তাকে জড়িয়ে ধরেছে। একটা বিরাট শব্দের মুখে পা শিঙ্কল পড়ে যাক্ষিল মোহর ঠিক সেইসময় তাকে জড়িয়ে ধরেছে দুটো হাত। তারপর টেনে নিয়ে এল নিরাপত্তার নিশ্চিতে। মোহর কৃতজ্ঞতায় তাকে জড়িয়ে ধরতে চোঁটে ভেজা ভেজা অথচ উষ্ণ স্বাদ পেল। উপকার যে করেছে সে

তাকে চুম্ব যাচ্ছে কেন? তার চোঁটে কেবলই চাপ পড়ছে। যে হাত দুটো তাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে দুটো এখন শিথিল হয়ে স্থান পরিবর্তন করেছে। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে তিনটে শব্দ বাজল, ‘মোহর, আমার মোহর।’

চোখ মেলল মোহর। ঘর অন্ধকার। এবং অন্ধকারের আড়াল সরে গেল চটজলদি। দীপ্তর গলা এবার স্পষ্ট, ‘তোমার আপত্তি নেই তো?’ ওর হাত এখন তার শরীর হাতড়াচ্ছে। হ্যাঁ। আপত্তি আছে। এভাবে কেন? প্রশ্নটা শুরু করার আগে শোনার অধিকার আমার ছিল। কিন্তু প্রতিবাদের চেষ্টা মাথায় দানা বাঁধছে না। একেবারে বাচ্চা ছেলের মত শরীর বিনিময় করল দীপ্ত।

প্রায়াক্ষকার ভোরে ঘুম ভাঙল মোহরের। চকিতে উঠে বসল সে। ঘরে বউদির শোয়ার কথা ছিল, তিনি শোননি। গত রাতে আনন্দিত হয়ে দীপ্ত কখন চলে গেছে তা সে জানে না। বিছানা ছেড়ে পোশাক পরিবর্তন করল মোহর। এইসময় তার কানে আওয়াজ এল। নাক ডাকার শব্দ। সম্ভবত সৌমেনদা। সে পাশের ঘরে উকি মারতেই দীপ্তকে ঘুমতে দেখল। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষকে কি রকম অসহায় দেখায়।

নিঃশব্দে বাইরের ঘরে চলে এল মোহর। বউদি ধারে কাছে নেই। হয়তো সৌমেনদার ঘরেই ঘুমাচ্ছেন। দরজা খুলল সতর্ক হাতে। টেনে দেবার সময় ঝুঁট করে শব্দ বাজল। তারপরেই সে সন্টলেকের রাস্তায়।

শেষরাতে অন্ধকার ঘাব ঘাব করছে। কিন্তু এই সময়ও প্রাতঃসময়ে বেরিয়েছেন বেশ কিছু স্বাস্থ্যহিলাসী। হনহনিয়ে ইটছিল মোহর। কিছুক্ষণ চলে আসার পর সে একটা বাস দেখতে পেল, আলো জালিয়ে আসছে। উঠে বসল মোহর। এটা কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করার কথা খেয়াল হল না। জানলার মুখ রাখতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। কাউকে না জানিয়ে এভাবে সে বেরিয়ে এল কেন? প্রশ্নটা মনে আসতেই একটু হকচকিয়ে গেল সে। উত্তরটা তার নিজেরই জানা নেই। মোহর নিজেকে ঠিক বুঝতে পারছিল না। দীপ্তর ওপর তার কোনও রাগ নেই। শুধু শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে। খুব।

সেনি নিকলে কফিহাউসে গিয়ে দীপ্তকে দেখতে পেল মোহর। একা বসে আছে। সে ওর সামনের চেয়ার নিয়ে বসতেই দীপ্ত অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, ‘আমি সত্যি খুব দুঃখিত।’

‘কারণ?’

‘তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ব্যাপারটা করেছি।’

‘লো! তো আগেই ভেবে রেখেছিলে। ও বাড়িতে রাত কাটানোর প্লান তো সেই কারণে।’

‘বিশ্বাস করো আমি মোটেই প্লান করিনি। ভেবেছিলাম হইচই করব। মাঝরাতে বউদি এসে আমাকে ডাকলেন। বললেন তুমি নাকি কথা বলতে চাইছ। ঘরে গিয়ে নিজেকে—’ কথা শেষ করতে পারল না দীপ্ত। মুখ নামিয়ে বলল, ‘আই অ্যাম সরি মোহর।’

‘ঠিক আছে। ওঠ।’

দীপ্ত অবাক হল, ‘কোথায়?’

'চল, বলছি।' দীপ্তকে পেছনে নিয়ে শ্যামাচরণ দে দ্বিটে নামল মোহর। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি খুব টায়ার্ড, টায়াকি করো।'
'যাবে কোথায়?'
'বলছি। আগে টায়াকি করো।'
কপাল ভাল ছিল। সেইসময় একটা খালি টায়াকি গলির ভেতর দিয়ে বের হল। তাতে উঠে বসে মোহর বলল, 'তোমার বাড়িতে কিভাবে যেতে হবে বলে দাও।'
'আমার বাড়িতে? কেন?' চমকে উঠল দীপ্ত।
'তোমার বাড়িতে যাব কারণ আজ তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত।'
'ওহ, সেটা আচ্ছই কেন?'
'নাহলে আমি স্বস্তি পাব না।'
'কিন্তু আমার যে কিছুর বলা নেই।'
'কি বলবে? ভয় নেই, আমি তোমার বিরুদ্ধে নাশিল করতে যাচ্ছি না।'
দীপ্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় ডাইলিভারকে নির্দেশ দিল। তারপর পাশে বসা মোহরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো বলেছি অন্যায় হয়ে গেছে।'
'আমার তো মনে হচ্ছে না সেকথা।'
'তাহলে যাচ্ছ কেন আমাদের বাড়িতে?'
'তুমি ভয় পাচ্ছ দীপ্ত?'
'না। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে আমি চাই। শুধু মনে হচ্ছে আমার একটু সের্ব ধরা উচিত ছিল। আমিই তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতাম। আচ্ছ তুমি জোর করছ, এটা না হলে ভাল হত। মোহর, আমি আমার মা ভাই বোনকে ভালবাসি। আমি চাইব তুমি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যাও। আমাদের সমস্যা তোমার সমস্যা হোক।'
হঠাৎই ভাল লাগল মোহরের। ভোরের পর একদিকে মন ঠিকঠাক হল।
দীপ্তর বাড়ি পুরনো ধাঁচের। অনেকদিন মেরামতি হয়নি। আসবাবপত্র সাবেকির সঙ্গে বর্তমানের বিস্তারকমের সহাবস্থান। বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে ভেতরে ঢলে গেল দীপ্ত। এটা চাননি মোহর। সে শুনতে চেয়েছিল দীপ্ত তার সামনে মায়ের কাছে কি পরিচয় দেয়। একটু বাদেই ভেতরের দরজায় একটা ছোট ভিড়কে রেখে দীপ্ত ঘরে এল। এদের একজন দীপ্তর মা। ভাড়া শরীর, পরনের পোশাকে অবহৃত। পাশে একটি তরুণী এবং বিবাহিতা মহিলা। দুটি বাচ্চাও রয়েছে। কেউ ঘরে ঢুকছে না অথচ চোখ বড় করে দেখছে।
দীপ্ত পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার মা, দিদি, বোন এবং দিদির দুটো বাচ্চা।'
'তুমি বুঝি পান্ট পরো।'
প্রণাম করবে কিনা ঠিক করার আগেই শুনতে পেল মোহর প্রশ্নটা। প্রসূর ধরনটা খুব অস্বস্তিকর। সে মাথা নাড়ল, 'ছেলেবেলার অভ্যাস।'
'হেলেবেলার তো বাচ্চারা চুসিকাঠি খায় তাই বলে বড় হয়ে সেটা খায় নাকি?'
'না। এই পোশাকে আমার স্বস্তি হয়।'
'ও। চুল বড় করানি কোনও দিন?'
'না। খেলাধুলা করতাম। তাছাড়া এভাবে কাটলে চুলের জন্যে সমস্যা নষ্ট হয় না।'
'যে রান্না করে সে চুলও তো ধোবে। বাড়ি কোথায়?'
'হলদপুরে।'
দীপ্ত বলল, 'কলকাতার বাইরে। প্রেসিডেন্সিতে পাড়।'
'ও। এখানে কোথায় থাকো?'

'এক আত্মীয়ের বাড়িতে।'
'বাধা কি করেন? ভাইবোন নেই?'
'স্কুলে পড়ান। আমি একাই।'
'দীপ্ত তো সব চাকরি পেয়েছে। এখনও পাকা হয়নি।'
এর উত্তরে কি বলবে মোহর ভেবে পেল না। দীপ্ত বলল, 'দিদি, তোরা কথা বল। মা, তুমি চা করে নিয়ে এসো।'
মোহর আপত্তি করল, 'না, চা খাবো না।'
দীপ্তর মা বললেন, 'ছুটকি, মিষ্টি নিয়ে আস। প্রথম দিন বাড়িতে এসেছে মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়। আমরা বাঙালি, আমাদের তো সৎস্কার আছে।'
অন্তএব মিষ্টি খেতে হল। আত্মকথা সময় পার হল যেন অনেক অনেক সময় লাগল। এই নিমন্তৃত্য অস্বস্তিকর। আবহাওয়া হালকা করতে দীপ্ত এলোমেলো কথা বলছিল কিন্তু তাতে কোনও কাজ হচ্ছিল না। ওর দিদি বা বোন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ওদের কাছে যে মোহর অন্য গ্রহের সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সে যদি শাড়ি পরে আসত, মাথার চুল কোমর ছাপিয়ে নামত তাহলে কি ওঁরা তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে খুশি হয়ে গল্প করতেন? মোহরের মনে হল, না করতেন না। ছেলের পরিচিতি কোনও যেকোনো এবাড়ির লোকজন নিজের করে ভাবতে শেখেনি। দীর্ঘকালের অভ্যাস সেটা শেখাননি।
নমস্কার জানিয়ে চুপচাপ বাইরে চলে এল সে দীপ্তর সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে দীপ্ত বলল, 'প্রথম দিন বলে ওরা একটু শেকি ছিল। তুমি কিছু মনে করো না।'
মোহর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছ, তুমি মদ খাও কি করে?'
'তার মানে?'
'তোমার বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই জানেন তুমি মদ খাও। সহ্য করেন?'
'আমি বাড়িতে এসে মাতলামি করি না।'
'করো না। তোমরা যেভাবে থাকো তাতে তোমার মদ্যপান তো বিলাসিতা। টাকাটা মাকে দিলে ওঁর উপকার হয়। আমাদের তো তাই মনে হল।'
'তাহলে আমার নিগারোটা খাওয়া উচিত নয়, কফিও নয়। কুয়ার ব্যাঙ হয়ে থাকো উচিত।'
'তোমাদের বাড়িটার শ্রী ফিরত তাহলে।'
'এটা বারোয়ারি বাড়ি। অন্য শরিক আছে। কেউ একা কিছু করতে পারবে না।'
'তোমার মা আমাকে পছন্দ করেননি।'
'প্রথম প্রথম তাই মনে হবে। কিন্তু তোমাকে একটু সের্ব ধরতে হবে।'
'কেন?'
'মায়ের নেচার গুইরকম। কদিন দেখলে মেনে নেন।' মোহরের দিকে তাকাল দীপ্ত, 'মোহর। ওদের দেখে আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে চাই।'
'আমিও।' ছোট শব্দ আলতো করে উচ্চারণ করল মোহর।
'আমি ওদের বুঝিয়ে বলব। আমার ওপর ভরসা রাখো।'
সেই রাতে বিছানায় শুয়ে কলকাতার একটু নিম্নবিত্ত বাড়ির মহিলাদের মুখ বারবার ভাবছিল মোহর। দীপ্তর বিধবা মা হরতো সারাঞ্জীবনে সুখের স্বাদ তেমনভাবে পাননি। অতৃপ্তি এবং অনুমুখ তাঁর সর্বাসে। হয়তো সেই কারণে তিনি নতুন কাউকে আত্মরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কী ওর দিদি অথবা বোন। ওদের ভক্তি বলে দিচ্ছিল মোহর যদি এবাড়িতে পাকাপাকি আসে তাহলে ওরা অমহায হয়ে পড়বে। দাদা একজন মহিলাকে নিয়ে এসেছে মানেই ওরা ঘরে নিয়েছে এই মহিলাই দাদার বউ হবে। সে বেরিয়ে আসার পর তিনজনেই সমানে মুখ চালিয়েছে। তার

চেহারা এবং কথাবার্তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। যে যত পারে খুঁত বের করেছে। দাদার রুচি নিয়ে বিকৃত কথা বলেছে। কেন এমন হয়? প্রকৃতি কেন মেয়েদের মনের দরজা-জানলাগুলো এভাবে বন্ধ করে রাখে? দীপ্ত যতই আশ্বাস দিক প্রথম দিনেই সম্পর্কের যে দূরত্ব তৈরি হল তা কখনও দূর হবে বলে মনে হল না মোহরের।

লেখা পাঠানোর পর ছয় মাস কেটে গেছে। সে যে একটা কিছু লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল তা নিয়ে এখন আর কোনও চিন্তা করে না। তবে কলকাতার লিটল ম্যাগ সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়ে গেছে দীপ্তর সঙ্গে বন্ধার কারণে। তাদের আয়োজিত সাহিত্যসভায় নিয়মিত যাতায়াত এখন। মোহর লক্ষ্য করল এইসব কবি গল্পকার যারা নিজেদের তরুণ তুর্কি বলে মনে করে তারা জনপ্রিয় এবং পাঠকপ্রিয় লেখকদের লেখক বলে স্বীকার করে না। তাদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতেও যেন ওদের রুচিতে বাধে। এবং সেই প্রসঙ্গে এন্ট্রিস্থিমেন্টের বিরোধিতা করতে ওদের উৎসাহ বেশি। নিজেদের পত্রিকা বেশি বিক্রি হয় না, প্রায় জোর করেই গছতে হয় কিন্তু সেই পত্রিকা যে যার মত জেহাদ ঘোষণা করতে কোনও ছিঁদা নেই। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে পরিকল্পিত উপায়ে লিটল ম্যাগাজিনের কোনও কোনও লেখককে দারুণ দারুণ বিশেষণে সাহিত্যে তুলে ধরার চেষ্টা। মুশকিল হল ওই চক্রার নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে কারণ পাঠকের মূল ধারায় ওই পত্রিকাগুলো পৌঁছানোই

দীপ্ত কিন্তু একটু অন্য ভূমিকায়। সে যেমন লিটল ম্যাগাজিনে তেমনি বড় পত্রিকায়। একারণে তার কিছু শত্রু থাকলেও দীপ্ত নিজের আচরণ পাশ্চাত্যে। মোহরের মাঝে মাঝে মনে হয় এদের অনেকেরই অক্ষম, অপট। লেখার চেয়ে কথা বলার শিল্পে দক্ষ। এমন একজন লেখককে নিয়ে এরা যাম্যামতি করে যিনি বছরে একটি লেখা লিখে থাকেন কিনা সন্দেহ। দু-একজনের লেখার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু বেশির ভাগ নিজেদের অক্ষমতা জানে বলেই গোষ্ঠী তৈরি করে দলবদ্ধ করে। দীপ্ত যে কেন এদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তা মোহর জানে না। প্রশ্ন করলে হাসে দীপ্ত।

ইদানিং সৃজনের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্সি থেকে পাশ করে সৃজন যাদবপুরে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু মিস কালকাতা হতে পাশ করেনি। দুজন রানারের একজনা হয়ে কাগজের হবিত্তে হেসেছিল সৃজন। সেই হাসিতে প্রচুর হতাশা দেখেছিল মোহর। সৃজনের জগৎ কখনওই সাধারণ মেয়ের সঙ্গে মিলত না। এখন তো নয়ই। মডেল হিসেবে সে কলকাতার প্রথম সারির।

গোলকপতির মৃত্যুর পর বাড়ির আবহাওয়ার তেমন বদল হয়নি। কাজের লোকটি এখন হাল ধরেছে। মাঝে মাঝে বড় ছেলে আসে। দুই ভাইয়ের মধ্যে গোলকপতির বিষয় নিয়ে মামলা শুরু হয়েছে। তাই দুজনেরই চাইছে যতদিন না আদালত একটা রফা করে দিচ্ছে ততদিন গোলকপতি যেভাবে বিলাসনে সেভাবেই বাড়িটা চলুক। মোহরের এ বাড়িতে থাকা যেন গোলকপতির ইচ্ছা বলে মনে নিয়েছে দুই পুত্র। অতএব বাসস্থানের সমস্যা এখন মাথা চাড়া দেয়নি। এটা স্বস্তিজনক।

সেবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয় সেটা লক্ষ্য করেনি মোহর। সেদিন বিকেলে কফিহাউসে ঢোকাতেই অনিন্দা বলল, 'তুই গেলি!'

'মানে?'

'এতদিন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকনামটাকে তুই একা দখল করেছিলি, আজ তোর নামের ডুপ্লিকেট দেখলাম। সে আবার লেখক। ছেলে না মেয়ে জানি না।'

মোহর বিস্ময়ে পাথর। আগামী সপ্তাহের পত্রিকায় মোহর মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ ছাপা হবে। বিজ্ঞাপনে নামটা দেখেছে অনেকের। সেই মোহর মুখোপাধ্যায় যে প্রেসিডেন্সির মোহর তা মেলাতে পারেনি কেউ। দীপ্ত এলা। বিজ্ঞাপন সে-ও দেখেছে। হেসে বলল, 'আমার মনে হল লেখাটা তোমার হলে মন্দ হত না।'

মোহর হাসল, 'তাই?'

দীপ্ত তাকাল, 'তোমার ভদ্রিটা সন্দেহজনক।'

'ঠিকই।' লেখাটা আমিহ পাঠিয়েছিলাম ডাকে। ছাপা হবে আশা করিনি।'

একজন তরুণ কবি বলেছিল টেবিলে, 'সত্যি ডাকে পাঠিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। অভিনাবি ডাকে।'

'তোমার কোনও চেনা লোক ছিল না?'

'না। বললাম তো ছাপা হবে আশা করিনি।'

হইহই শুরু হয়ে গেল। নামী পত্রিকায় লেখা ছাপা হচ্ছে অতএব সেনিট্রেট করো! কফিতে

চলবে না, মাল ঝাওয়াতে হবে। দীপ্তর উল্লেখ্যে কফিতে ব্যাশারটা মিটল। কিন্তু মোহর সন্নিহনে লক্ষ্য করল কেউ তাকে নিবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও প্রশ্ন করল না। যারা এখন প্রশান্ত মুখে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে তাদের অনেকেই ওই পত্রিকাকে গালাগালি দিয়ে মুখে পাথ।

ফোরার পথে দীপ্ত বলল, 'স্ববর্তা ভূমি আমার কাছে চেপে গিয়েছিল!'

'এটা যে কখনও স্ববর্তের মত মনে হবে তাই মনে হয়নি।'

'প্রবোধ কি লিখে?'

'সেটা বলব না। পড়ে দেখতে হবে। গুঁটা ঠিক প্রবন্ধ নয়।' প্রশ্নটা শুনে মুগি হলে মোহর।

গুত্রার বিকেল কালেক্ট ট্রিটে পত্রিকা পেয়ে গেল মোহর। প্রচণ্ড উত্তেজনা তখন। কাঁপা আঙুলে সূচিপত্রের পাতায় নিজের নাম খুঁজে পেল না। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রথম পড়ল সে। তারপর নির্দিষ্ট পাতায় পৌঁছে বুক জুড়ে একটা নিটোল আকাশ পেয়ে গেল যেন। এই বয়স পর্যন্ত যেসব সুখের স্বাদ সে পেয়েছে সেসব এখন ম্লান হয়ে গেছে। দ্বার শরীরের শিরায় শিরায় যে বিক্ষণরূপ ঘটেছিল সেটা যেন নেহাউই জ্বালা, এইসময়। 'দিদি, দামটা', শুনে পত্রিকার বিজ্ঞপ্তার দিকে তাকিয়ে মনে হল একে গোটা পৃথিবীটা দিয়ে দেওয়া যায়।

দাম নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে মুশ্কেলে পড়ল মোহর। একটুও অপেক্ষা না করে এখনই পড়ো ফেলতে কেউই করতে ছাপার অক্ষরগুলো। কিন্তু রাষ্ট্রা দাঁড়িয়ে পড়া যায় না, কফিহাউসে গিয়ে পড়লে কেউ না কেউ হাসবে। সে সোজা কলেজ ফিরে এল। লাইব্রেরিতে ঢুকে একটা নির্জন টেবিল বেছে নিয়ে পত্রিকাটা বুলল। নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়লে কেমন অচেনা মনে হয়। অন্য কারও লেখা পড়ার স্বাদ আসে। মোহর আবিষ্কার করল তার লেখার একটি লাইনও সম্পাদকশাই বদল করেনি। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আরও অনেক কথা বলার ছিল যা না বলায় লেখাটা ইনকমপ্লিট থেকে গেছে। বেহুলা র চরিত্রটা মনে করতে করতে ওর মনে হল মেয়েটার কোনও অধিকার মনে না পছন্দসই পুরুষের কাছে পৌঁছাবার। থাকলে নিশ্চয়ই অমর স্বামীকে নিয়ে জলে ডালত না। সে তুলনায় যেনকারা উল্লীশীর পছন্দের ব্যাপারে যেমন স্বাধীনতা ছিল। আকাশ নিয়ে উড়ে যেতে যেতে অথবা জঙ্গলে বেড়াবার সময় কোন মূর্খকে ব্যবহার করবে তারাই ঠিক করে নিত। অবশ্য দেবতার যখন বিশেষ কোনও অভিযানে পাঠাতেন তখন সেটার উপায় ছিল না। বাড়লি মেয়েদের কোনও পছন্দই তৈরি হয়নি। সেব্যাপারে তারা সবসময় নির্ভর করে অন্যের ওপর। দুর্দশা সেই কারণে। বারবনিও পছন্দের ব্যাপারে ঘরের বউয়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কথাটা মনে আসতেই সে নড়েচড়ে বসল। এ নিয়ে তো চমৎকার একটা লেখা তৈরি করা যায়। একটি সাত আট বছরের বালিকাকে তার পরিবার এবং

পারিপার্শ্বিক যে সব ধর্মকর্ম পালন করতে বাধ্য করতে তাই তার জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করেছে এককাল। আট দশ বছর বয়সে শিবলিঙ্গ নামক পাথরটির ওপর জল ঢালতে শেখানো হয়েছে। কিন্তু সেই চিন্তা থেকে তার মনে যদি যোনীকাক্ষা জাগ্রত হয় তাহলে তাকে অসতী বলবে সমাজ। পুজার সময় ঘটা করে কুমারী পূজা করা হয়। কুমার পূজা? সেটা তো বারবনিতা পাড়ায় চল ছিল বলে পড়েছে মোহর। কাগজ বের করে নেট করতে করতে সময় গড়াছিল। হঠাৎ খোয়াল হতে সে উঠে পড়ল। দীপ্তুরা নিশ্চয়ই কফিহাউসে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে। এক্ষণে দীপ্ত অবশ্যই পড়ে ফেলেছে পত্রিকার লেখাটা। মুশোমুখি হলেই জানতে পারবে ভালমন্দ ব্যাপারগুলো।

কফিহাউসে ঢুকে অবাক হল মোহর। ওরা কেউ নেই। বালি টেবিলে গিয়ে বসতেই রামু এদিয়ে এল, 'আজ আপনি লেট দিসিমসি।'

'ওরা এসেছিল।'
'হ্যাঁ। দীপ্তবাবুয়া দুতিনজন খালাসিটোলায় চলে গেল। আজ চল্লিশ সাল ধরে দেখছি যেসব বাবু লেখা করে তারা মদ খায়। প্রথম দিকে খারাপ থাকে পরে ভাল হয়ে যায়।' রামু এখন বৃদ্ধ। বেশি কথা বলে। বেয়ারার ভূমিকায় ওকে এখন কেউ ভাবে না।

কিন্তু মোহরের খারাপ লাগল। অনেক বিখ্যাত লেখককে অনেক বছর ধরে রামু দেখেছে। তারা মদ খেত কি না তাতে কিছু যায় আসে না মোহরের। কিন্তু আজকের দিনেও দীপ্ত একটু অপেক্ষা করতে পারল না? না হয় তার এখানে আসতে দেরি হয়েছে। মোহর আবিষ্কার করল তার প্রচণ্ড অভিমানে হচ্ছে। এরকমটা তার কখনও হয়নি। 'অভিমান শুধু মেয়েদেরই হয় না, মানুষমাত্রেরই হতে পারে। কফিহাউসের সিঁড়িতে পা দিয়ে মোহর ঠিক করল দীপ্তকে ঝুঁকে বের করবেই। ওরা যখন খালাসিটোলায় গিয়েছে তখন সে সেখানেই যাবে। দীপ্ত যতই তাকে বোঝানোর ওই জ্বরগায় মেয়েরা যায় না তবু সে যাবে। এর আগে ওদের মুখে সে খালাসিটোর অবস্থানকে কণা শুনেছে। অতএব ট্রামে উঠে বসল মোহর। সুবেশ মস্তকি স্কেকারে ট্রাম থেকে নেমে এগোতে লাগল সে। এদিকে রাস্তায় এখনও বেশ ভিড়। হঠাৎ দুটো অবাঙালি ছেলে তার দিকে মস্তব্য হুঁড়ে দিল। কলকাতায় থাকতে থাকতে সে বুকেছে এসব ব্যাপার উপেক্ষা করতে হয়। যতটা সম্ভব এড়িয়ে বিয়ার একটা কায়দা এই শহরের মানুষ রপ্ত করে নিয়েছে। মোহর ধীরে ধীরে সেটাও শিখেছে। মোহর দেখল ছেলেদুটো তার পাশে চলে এসেছে। একজন বলল, 'বহুত আচ্ছা মাল হ্যায়। পুছকে দেখাে চার্জ কিডনা হ্যায়।'

মোহর দাঁড়িয়ে গেল। সে দেখল ছেলেদুটোও সামনে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ফোটাল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবেন?'

প্রথমজন প্রশ্ন করল, 'কত দিতে হবে?'

'কি জন্যে?'

'হুতি হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে হাত এবৎ পা ঢালাল মোহর। আঘাত পাওয়া মাত্র ছিটকে গেল ছেলোট। দ্বিতীয়টি এত কিছু বুঝে ওঠার আগে পেটে হাত চেপে বসে পড়ল। দুজনকে পাশাপাশি টেনে এনে আরও কয়েকটা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল। একটি মেয়ে দুটো ছেলেকে অমন খোয়াই দিচ্ছে তাকে মজা পাচ্ছিল সবাই। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন তার নাম ধরে ডেকে উঠতেই চমকে ফিরে তাকাল মোহর। হঠাৎ তার শরীর কাঁপছিল। মোহর দেখল ছেলোট দীপ্তদের বন্ধু। কয়েকদিন ওর সঙ্গে কফিহাউসে এসেছে।

'এই দ্যাখো না, অন্ত্রীল প্রস্তাব দিচ্ছিল—।'

'চলে এসো, চলে এসো আমার সাথে—।' প্রায় টেনেই তাকে বের করে নিয়ে এল ছেলোট। পার্কের কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একাই মারলে দুজনকে?'

'ওরা তোমার জন্যে কম মার খেল।'

'বাপুস। তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?'

'খালাসিটোলায়।'

'সেকি? তুমি ওখানে গিয়ে কি করবে?'

'দীপ্ত ওখানে গেছে। ওকে আমার দরকার।'

'ছেলেটি কিছু ভুলে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি গিয়ে ডেকে আনি?'

ও চলে গেল মনে মনে ধ্যানদাকে ধন্যবাদ দিল মোহর। এই বিদ্যেটা প্রতিটি মেয়ের শেখা উচিত নইলে এইসব নরপশুরা ঠাণ্ডা হবে না। মোহর লক্ষ্য রাখল। দূরত্বটা বেশি নয় কিন্তু যারা অন্যায় করে মার খায় তারা আবার প্রতিশোধের জন্যে উঠে আসার শক্তি পায় না।

ছেলেটি ফিরে এসে হাসল, 'ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'কোথায় গিয়েছে? বাড়িতে?'

'না। বাড়িতে নয়। ছেড়ে দাও। কাল দেখা করো।'

'মোহর তাকাল, 'তুমি কি ওখানে শুনেছো কোথায় গিয়েছে দীপ্ত?'

'দীপ্ত একা নয় আর আমি যে ঠিক শুনেছি তাই বা কি করে বলি?'

'কি শুনেছ?'

'একজন পরিচিত লোক ওখানে মদ খাচ্ছিল। সে বলল, আচ্ছা মোহর, ওরা যেখানে গিয়েছে সেখানে তুমি একা যেতে পারবে না।'

'কোথায় গিয়েছে তোমাকে বলতে হবে।'

'মুশকিল হল। লোকটা তো মিথ্যে কথাও বলতে পারে।'

'সেটাই শুনি।'

'ওরা সোনাগাছিতে হুইচি করতে গিয়েছে। হঠাৎ বোধহয় শব হয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র মোহর হাঁটতে লাগল। ছেলোটাকে পেছন থেকে ডাকলেও সে দাঁড়াল না। এক ঘোরে হেঁটে এল সে বড়বাজারে ছিট পর্যন্ত। এসময় তার মাথা কাজ করছিল না, কানে কোনও শব্দ শোনাচ্ছিল না। দীপ্ত সোনাগাছিতে গিয়েছে? বড়বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছে হল সোজা সোনাগাছিতে গিয়ে সে দীপ্তর সামনে হাজির হতে। ওকে প্রশ্ন করে কোন সুখ বা হুতির জন্যে তুমি এখানে এসেছ? ওর মুখের ওপর এক দলা খুঁত ফেলে চলে আসবে সারা জীবনের জন্যে। কিন্তু সোনাগাছি একটা দোকান নয় যে সেখানে গেলেই দীপ্তর দেখা পাওয়া যাবে। ট্রাম ধরে সোজা মুক্তারামবাড়ি ছিট চলে এল সে। দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। সম্পর্কটা মারা গেল। মনে মনে ভালল মোহর। প্রাণেশ যা করত তা মুখে বলতে একটুও দ্বিধা করত না। প্রাণেশকে জীবনসঙ্গী করা যায় না কিন্তু কিছুক্ষণের সঙ্গী হিসেবে আকর্ষণও বোধ করতে হয়। সেদিক থেকে দীপ্ত একদম চোরের মত আচরণ করেছে। হয়তো কথা তুললে বলবে স্ট্রেজ অভিজ্ঞতা সন্ধারের জন্যে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা কবিতার কারণে প্রয়োজন। কিন্তু দুর্বল পুরুষরাই শুধু অজুহাত তৈরি করে।

রাতে ঘুম আসছিল না। খিদেও লাগছিল। কোনওমতে রাতটা কাটিয়ে দিল মোহর। তারপর ভোর হতেই মনে হল দীপ্তর সামনে যাওয়া উচিত তার। যত অন্যায় করুক দীপ্ত ওকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। দীপ্তর হাসি, কথা, কবিতার লাইন, গায়ের গন্ধ—মিলেমিশে প্রবলভাবে তাকে আকর্ষণ করছিল। ওর দেখা পাওয়ার জন্যে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর কয়েক যুগ ধৈর্য ধরার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

কলকাতার হস্তী এলাকাগুলোও রোদ ওঠার আগের সময়টায় কিরকম নরম নরম থাকে। মনযোজ্ঞ ভাল থাকলে চমৎকার উদারতা চরাপাশে তাকিয়ে থাকে। দীপ্তর বাড়ির সামনে পৌছে মোহরের সেইরকম মনে হল।

রাস্তায় দুচারজন অলস মানুষ। গলিতেও ভিড় নেই। দীপ্তদের বাড়ির দরজা আধেজ্বানো। অর্থাৎ ও বাড়ির মানুষের দিন শুরু হয়ে গেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন মোহর ইতস্তত করছে তখন একটা প্রায় মাজাভাঙা বুড়ি বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে জল ছিটোতে লাগল। কাজটা শেষ করে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?

মানুষটি হাড়সর্বশ্ব। পরনের ধান পাড়ালি স্পর্শ করেনি। জামা না পরায় বুক প্রায় উন্মুক্ত কারণ আঁচল একদিক দিয়ে শুটিয়ে কাঁধে পৌছেছে। বয়স কত তা বুড়িই জানে কিন্তু চিন্তে হয়ে যাওয়া বুক আর লজ্জা পাওয়ার অবকাশ রাখেনি। একটি শিশু অথবা পুরুষের সঙ্গে এবুড়ির কোনও পার্বক্যও ব্যাপারে নেই।

মোহর বলল, 'দীপ্তর কাছে এসছি। ওকে ডেকে দেবেন?'

'সে তো এখন ঘুমাচ্ছে। অটটার আগে উঠবে না।'

'আমার খুব জরুরি দরকার।'

'দাঁড়াও তার মাকে গিয়ে বলি।' বুড়ি চলে গেল।

তাহলে দীপ্ত আটটা পর্যন্ত ঘুমায়। এককালে বাগানবাড়ি ফেরত যেসব মানুষ দুপুর পর্যন্ত ঘুমাত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে নাকি। রাতে বদ খেয়ে ঘুর্টি করে এসে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে। টোট কামড়াল মোহর। তার খুব রাগ হচ্ছিল।

এইসময় দরজায় একটি মুখ উকি মারল। তাকে দেখেই মুখভঙ্গি পাশ্টে গেল। দীপ্তর ছোট বোন। কি করবে বুঝতে না পেরে মেয়েটি বলল, 'আপনি?'

'হ্যাঁ। অসময়ে এসছি। তোমার দাদার সঙ্গে খুব দরকার আছে।'

'দাদা তো ঘুমাচ্ছে।'

'শুনলাম। ডেকে দেবে একটু।'

'ও। ঠিক আছে। ভেতরে এসে বসুন।' মেয়েটা দরজা ভাল করে বুলে দিল। ঘরে পা দিয়ে মোহরের মনে হল বাসি শব্দটি চরাপাশে ছড়ানো। এখানেও রাতে কেউ শোয়। তার বিছানা মাটিতে গোঁদানো, তোলা হয়নি।

যে চেয়ারে সে আগের দিন বসেছিল সেখানে বসতেই মেয়েটা চলে গেল। একটু পরেই চাপা গলা কানে এল, 'ঘরে বসালি কেন?'

'কি করব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে পাড়ার সবাই জানবে। তুমি যাও।'

'আমি এখন গিয়ে কথা বলতে পারব না। দাদাকে ডাক গিয়ে।'

এরা অসন্তুষ্ট। এমন অসময়ে বাইরের লোককে কে-ই বা পছন্দ করে। মোহর হাসল। তার এখন মনে হচ্ছে আবেগের প্রাবল্যে এভাবে চলে আসা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু না এসে সে পারছিল না। এখন যদি ওদের আপত্তি না থাকে তাহলে সে সোজা দীপ্তর ঘরে ঢুকে যেতে পারে। সলাপ কানে যাওয়া সত্ত্বেও সে ক্ষুব্ধ হলে না।

মিনিট তিনেক অপেক্ষার পর দীপ্তকে দেখতে পেল সে। পৃথিবীর শেষ বিস্ময়কে যেন চোখের সামনে দেখছে এমন মুখের ভাব। ওর কপালে একটা স্পষ্ট কালশিটে। দরজায় দাঁড়িয়ে দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি?'

কি বলবে মোহর। যা যা বলবে ভেবে এসেছিল ওই প্রশ্নের ধরনে সেসব যেন চাপা পড়ে গেল। মোহর হাসার চেষ্টা করল।

সামনের চেয়ারে বসে দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বল তো?'

নিজেকে পাশ্টাল মোহর। যথেষ্ট স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'কাল পত্রিকা দেখেছ?'

'পত্রিকা? ও হ্যাঁ, তোমার লেখা বেরিয়েছে। পড়েছি।'

'কেমন লেগেছে?'

'ওয়েল। ঠিক আছে। তবে একটু একপেশে। মানে ওই আক্রমণটা।'

'কি রকম?'

দীপ্ত মাথা নাড়ল, 'পরে এ নিয়ে কথা বলব। এখন মাথা ঠিক কাজ করছে না। ও হ্যাঁ, কাল কফিহাউসে তোমার জন্যে অনেককণ অপেক্ষা করেছিলাম।'

'না। সাতটার মধ্যে তোমরা চলে গিয়েছিলে।'

'তা হবে। বুড়ি দেখিনি। মোহর, হঠাৎ এভাবে এলে কেন?'

'তোমার কপালে কি হয়েছে?' জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল মোহর।

'আর বোলো না। এত জোর ধাক্কা লেগে গেল। চা খাবে?'

'না।'

'তোমার বাড়িতে এ যুহুতে আমি অবস্থিত।'

'কে বলল তোমাকে?'

'যেই বলুক। চা খেতে হলে বাইরে যাওয়াই ভাল।'

দরজায় শব্দ হল। দীপ্তর দিদিকে দেখতে পেল মোহর। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, 'এ কি কথা ভাই। ভোরবেলায় বাড়িতে এসে বাইরে চা খাবে কেন?'

মোহর সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'বিরক্ত করতে চাইনি, তাই।'

'বিরক্ত মনে করলেই বিরক্ত। এই যে দীপ্ত, আমরা সাড়ে আটটার আগে ঘুম ভাঙলে কৃক্কেজ করত, কই, আজ তো কিছু করছে না। সাপ তো বেজিকেই ভয় পায়।' দিদি হাসলেন।

দীপ্ত একটু বিরক্তগলায় বলল, 'কি যা তা বলছিস?'

'কানে এল তাই কথাটা বলতে এঘরে এলাম। যদি বলিস চলে যাব।'

'আমি কি তোকে চলে যেতে বলেছি। আশ্চর্য!'

'তুই তো আজকাল সবকিছুতেই আশ্চর্য হচ্ছিস। এই যে সাতসকালে মোহর এ বাড়িতে এল তার কাছে আমরা তো বলছি না আশ্চর্য। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি মুখের ওপর সত্যি কথা বলে ফেলি, আমাদের পরিবারের কোনও মেয়ে এই কাকভোরে অন্যের বাড়িতে যায় না।

মোহর বলল, 'এ সময় আমার আসা ঠিক হয়নি। কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই তোমার খুব দরকার হয়েছে। আড্ডা মারতে তো আসোনি।'

'হ্যাঁ। দরকারেই এসেছি।'

'তাহলে তোমরা সেটা পেরে নাও। আমি চা নিয়ে আসছি।' দিদি ফিরে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে দীপ্ত মাথা নাড়ল, 'আই অ্যাম সারি।'

'কিন্তুন্যে?'

'তোমাকে অপমানিত হতে হচ্ছে বলে।'

'উনি তো মিথ্যে বলেননি। অপমানিত যদি হই সেটা গতকাল হয়েছি।'

'বুঝলাম না।'

'তোমার দিদি বললেন এ বাড়ির কোনও মেয়ে কাকভোরে অন্যের বাড়িতে যায় না। অবশ্য এখন কাকভোর নয়। কিন্তু এ বাড়িই ছেলে, ধারা, তোমার বাবা, দুর্দর্শা কি অনেক রাতে মধ্যপন করে বাড়ি ফিরতেন? পরিবারে সেই রেওয়াজ আছে?'

'ও। আমি মনে বাই মাঝে মাঝে সেটা তোমার জানা।'

‘জানি। কফিহাউস থেকে বেরিয়ে কবি লেখকরা খালাসিটোলায় যায় একটা রোমান্সিসিঙ্কমের তড়ানায় এমন ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু গতকাল কি আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারতে না তুমি?’

‘তুমি এলে না, ভাবলাম আর আসবে না, সবাই এমন করে ধরল—’

‘কতক্ষণ ছিলে খালাসিটোলায়?’

‘অবাক হল দীপ্ত, ‘কেন?’

মোহরের মনে হল আর একটু যাচাই করতে চাইলে তাকে মিথ্যে কথা শুনতে হতে পারে। দীপ্ত মিথ্যে বলছে এটা মনে নিতে পারবে না সে কখনওই। যেন নিজের বিপদ কাটিয়ে উঠতেই মোহর বলল, ‘তুমি সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে।’

‘মাই গড! তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি?’

‘তোমার সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করছিল।’

‘উঃ! তোমাকে বলেছি ওখানে কোনও মহিলার যাওয়া উচিত নয়।’

‘যাওয়া উচিত নয় বলেছি তাই যাইনি। আমি ভেতরে যাইনি কিন্তু তোমার পরিচিত একজন ভেতরে গিয়ে আমাকে খবরটা এনে দিয়েছে।’

‘সে বলেছে আমি ভেতরে নেই।’

‘এবং সত্যি তুমি ছিলে না।’

‘হ্যাঁ। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।’

‘তোমার সঙ্গে আরও লোক ছিল।’

‘হ্যাঁ। আমরা তিনজন।’

‘বেরিয়ে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?’

‘তুমি কিন্তু এবার আমাকে চোজ করছ।’

‘আমি তোমার মুখে সত্যি কথা শুনতে চাইছি।’

‘বেশ। ওরা বলল সোনাগাছিতে যাবে। একটু গান শুনবে, ঘূর্তি করবে। আমার মনে হল দর্শক হিসেবে ওদের সঙ্গে গেলে কোনও অন্যায্য করব না। তাই গিয়েছিলাম।’

‘তোমার কাছে আমি কৈফিয়ত চাইনি।’

‘না। তুমি যেভাবে প্রশ্ন করছ—’

‘আমি খুব সরলভাবে জানতে চাইছি। তুমি দর্শক হিসেবে গিয়েছিলে না অন্য কিছু সেটা তোমার ব্যাপার। আমি বুশি হয়েছি কারণ তুমি যে সোনাগাছিতে গিয়েছিলে এই সত্যিটা আমাকে বলেছ, তাই।’

দীপ্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মোহরের দিকে। স্পষ্টতই তাকে অবাক লাগছিল। এরকম খবর সোনার পর মোহর শাশুভায়ে বসে আছে। যে কোনও মানুষ এই নিয়ে চরম অশান্তি করত। এইসময় দিদি চা নিয়ে এলেন।

দীপ্ত চা নেওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কপালে কি হয়েছে রে?’

‘ধাকা লেগেছিল।’

‘যা ভাল বুঝিস তাই কর। ওই ছাইপাশ না খেলে কি হয়।’

‘আবার আরম্ভ করলি?’

‘চায়ে চমুক দিল মোহর। বলল, ‘মারপিট করেছিলে?’

‘মারপিট ঠিক নয়—’ দীপ্ত মাথা নাড়ল।

দিদি বললেন, ‘শোন ভাই। মনে হচ্ছে তোমরা খুব বন্ধু। দীপ্ত আগে কখনও এমন ছিল না। লেখালেখি শুরু করার পর ছাইপাশ খেতে লাগল। বাড়িতে এনিয়ে খুব অশান্তি। এক ছেলে বলে মা কিছু বলতেও পারে না। তুমি একটু বোঝাবে ওকে?’

‘ওর যদি মনে হয় অন্যায্য করছে না তাহলে ওকে কেউ বোঝাতে পারবে না। কাল যেখানে গিয়ে মারপিট করেছে সেখানে নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবারের কেউ যায়নি দিদি। ও গিয়েছিল। আমি বোঝাও ওর যাওয়ার ইচ্ছে হলে যাবে।’

দিদি মাথা নাড়লেন। তারপর আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

চুপচাপ চা খেল ওরা দীপ্ত মুখ ফিরিয়েছিল অন্যদিকে। মোহর ওকে লক্ষ্য করছিল। ওর মুখ, মুখের রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্রমশ এক মায়ার আচ্ছন্ন হল। তার মনে হল দীপ্ত যাই করুক সাধনে এসে সত্যি কথা বললে সে ক্ষমা করে দেবে চিরকাল।

‘চা শেষ হলে উঠে দাঁড়াল মোহর, ‘আমি যাচ্ছি।’

‘চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।’

‘দিসিক বলে—’

‘ঠিক আছে।’ দীপ্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

গলিতে দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। এবং তখনই প্রাপ্তপের মুখ মনে পড়ল মোহরের। রানীগঞ্জের কোন বাজারি মেয়ের কাছে গিয়ে প্রাপ্তপের অসুখ হয়েছিল। সেই একই অসুখ দীপ্তরও হতে পারে। মোহর দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘কি হল?’ দীপ্ত অবাক।

‘তুমি আজই ডাক্তারের কাছে যাবে।’

‘কেন? এই কলসিটির জন্যে। হাত। এমন ঠিক হয়ে যাবে।’

‘কলসিটির জন্যে নয়। তুমি যেখানে গিয়েছিলে সেখান থেকে অসুখ ফুটিয়ে আনা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। পরীক্ষা করিয়ে নাও।’ জোর গলায় বলল মোহর।

‘কি যা-তা বকছ। আমি এমন কিছুই করিনি যে অসুখ হবে।’

‘বস্তির নিশ্চয় ফেলল মোহর। দীপ্ত হাঁটতে শুরু করে বলল, ‘আমি তোমাকে বিশ্বাস করি দীপ্ত। তাই নিভ ইউ।’

‘আমিও। মাঝেমাঝে উন্টোপান্টা হয়তো করে ফেলি। ভেজা বাঙালির রুটিন লাইফ মেনে চলা আমার ধাতো নেই। তাই তোমার খারাপ লাগতে পারে।’

‘মোটাই না। তুমি হয়তো অসাধারণ নও কিন্তু সাধারণের সঙ্গে তোমার মেলো না। আমি তাই চাই। কিন্তু কখনও আমাকে মিথ্যে কথা বোলো না।’

‘আমি আজ অবধি নিশ্চয়ই বলিনি।’

‘এভাবে এলাম বলে তুমি রাগ করছে?’

‘ঠিক রাগ নয়। কিন্তু আমি চাই না আমার বাড়ির লোকজন তোমাকে অসম্মান করুক।’

‘তাহলে তোমার বাড়িতে কখনওই আসা হবে না?’

‘তা কেন? এলে মাথা উচু করে আসবে।’

‘সেটা কিভাবে হবে আমি জানি না।’

ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। মোহরের লেখা পত্রিকায় ছাপা হবার পর পরিচিত মানুষদের মুখে কোনও আলোচনা শোনেনি সে। হলদুপরে চিঠি লিখে বাবাকে জানিয়েছিল মোহর লেখার কথা। অরুদা মুখার্জি চটপট জবাব দিয়েছেন অনেক প্রশংসা করে। অত বড় পত্রিকায় নিজের মেয়ের লেখা ছাপা হলে যে কোনও বাবাই খুশি হবেন বলে ওই চিঠির তেমন গুরুত্ব

দিত চায়নি মোহর। কয়েকদিন পর পত্রিকা মারফত নন্দিনীর চিঠি পেল সে। নন্দিনী ভাকারি পড়ছে। সে লিখেছে, 'শেষ পর্যন্ত তুমি লেখালেখি শুরু করলে। আমি তোমাকে বলতাম লেখা তোমার হাত পারে। তাই আমার নিজস্ব ভাল লাগা তোমাকে জানালাম। তোমার বিষয় আমি পছন্দ করছি না। আজকাল মেয়েদের হয়ে ওকালতি সবাই করে। মেয়েরা একশ্রেণীর অসহায় প্রাণী আর 'পুরুষেরা নারীখাদক এমন ছবি আঁকার পেছনে যে মাসিকটা তাকে বেধেহয় সমর্থন করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এটা করে এখনও কিছু সস্তার হাততালি পাওয়া যায় কিন্তু ইস্টাটা ক্রমশ ক্রিশ হয়ে এসেছে সেটা তোমার বোকা উচিত। নারীপুরুষ দুটি সমান শ্রেণীর প্রাণী। নারী বলে দয়া কর দয়া কর বলার কি আর দরকার? তোমার বেহেলা চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। আচ্ছা ধরো, তুমি যা যা লিখেছ তাই করে বেহেলা স্বাধীর জীবন বাচাল। ভাড়াপার লক্ষীর ওকে সন্দেহে চোখেও দেখল। শ্রী দেবসমাজ ক্যাবারে নেচেছে জানার পর পৃথিবীর সব পুরুষেরই বুক ফুল্লির হয়ে যায়। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়ে থাকে? বেহেলা যদি লক্ষীরদেবে এই বলে শাসনে রাখে যে তোমার জীবন আমি ঠাট্টিয়েছি অতএব আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে তাহলে তো তোমার বিশ্লেষণ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। সেই সুযোগে দেবলোকের কোনও কোনও লম্পট দেবতা বেহেলার সঙ্গে টুকটাক প্রেম কর যেতে পারে ওর ইচ্ছায়। অতএব দ্যাখো, সব শেষই শেষ নয়। তবে তোমার বলার ধরন ভাল। বুঝ রসালো। ভাল আছি। পারলে চিঠি দিয়ো। একই শহরে থাকি, হচ্ছে হলে আসতেও পারো। নন্দিনী।'

এ চিঠি মোহরের মোটেই খুশি করতে পারেনি। নন্দিনী যতই বলুক এখনও এই বাংলায় নারী-পুরুষ এক শ্রেণীতে জায়গা পাচ্ছে না। এখনও মেয়ে হয়েছে জানলে বাড়ির মেয়েদের মুখ কালো হয়। এখনও বাড়ির অল্পবয়সি মেয়েকে নানান পাহারায় রাখা হয়। এখনও মেয়েরা পুরুষের কল্যাণ কামনায় সারাদিন উপোস করে থাকে। কোনও পুরুষকে মেয়েদের জন্যে ওই কর্মটি করতে শোনা যায়নি। হঠাৎ আমরা এক মানের হয়ে গেছি বলে চিৎকার করলে সেটা অত্যন্ত অবাস্তব হবে। নস্যৎ করার জন্যে কাছা বলায় শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি নেই।

দুই সন্ধ্যা পরে পত্রিকায় কিছু চিঠি ছাপা হল। প্রথম চিঠি একজন সর্বশিক্ষেয়া প্রবীণা লেখিকার। তিনি দুহাতে আশীর্বাদ করছেন এমন রচনার জন্যে। সেইসঙ্গে সাধনায় কয়েকনে প্রতিদান করতে গিয়ে অযথা আঘাত দেবার প্রবণতা থেকে যেন মোহর নিজেকে সতর্ক করে। তিনি নিজে সারা জীবন মেয়েদের হয়ে লিখেছেন, তাঁদের সমস্যার কথা বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু এই নিষ্পত্তি লিখতে পারলে তিনি খুশি হইতেন বলে জানিয়েছেন।

সম্ভবত এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা বদলে গেল। সম্পাদকের চিঠি পেল মোহর অবিশেষে আর একটি রচনা পাঠাতে হবে।

ষষ্ঠীয় রচনাটি শুরু করল মোহর এইভাবে, 'আমাকে পত্রিকার সম্পাদক লিখতে বলেছেন। তিনি একজন পুরুষমানুষ। আমার পিতাও একজন পুরুষ। যে মানুষটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, যার সঙ্গে জীবনযাপন করার পরিকল্পনা আছে সে-ও পুরুষ বলে জানি। অতএব পুরুষদের বিরুদ্ধে আমার কোনও জেহাদ থাকতে পারে না কারণ তাদের অধিকাংশই অজ্ঞান বলে মনে করি।'

এবারের রচনার বিষয় ধর্ম এবং নারী। যেহেতু পুরুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছিল নিজের ইচ্ছানুযায়ী এবং সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে এবং সেই কারণে নারীকে সবশেষ রাখতে পেরেছে দীর্ঘকাল। এখনও একজন মহাশুরু ঘোষণা করতে পারেন বৈদিক মন্ত্রে নারীর কোনও অধিকার নেই। এই হাস্যকর তথ্য এ দেশের নারীরাই মেনে নিয়েছে এতকাল। পছন্দ ফিরে তাকালে মনে হয় ধর্ম নামক এক ভয়ঙ্কর ড্রাগ মেয়েদের রক্তে মিশিয়ে দিয়ে তাদের চিত্তাধিপত্যে অর্কবর্ষ করে রাখা হয়েছিল যা কাটিয়ে উঠতে এখনও সক্ষম হয়নি। কলকাতায় এগুলো বারোয়ারি পূজা হয়

তার একটিভিত্তে কোনও মহিলাকে পৌরোহিত্য করতে দেখা যায় না। যদি কেউ করেন, মহিলা পরিচালিত সেই পূজা খবরের কাগজে বড় জায়গা পাবে। বিধাবাদের কিছু অংশ সবে আর্মিস খাওয়া অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু বাকি অংশ এখনও তিরিয়ে। মেয়েরা এগিয়ে এসেছে অন্ধকারকে অবলম্বন করে। কাঁধে বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড গরমে যেসব পুরুষরা এতকাল তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যেত, তাদের মিথিলে এখন কিছু অশিক্ষিতা মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। সেই উদ্ভাসনা কি কারণে জানতে চাইলে নির্ধোঁ উত্তর পাওয়া যাবে। ওই যাত্রাপথে সেইসব মেয়ে কি স্বাধীনতার আনন্দ পাচ্ছে? যেদেশে এইসব অন্ধ আচরণ এখনও সমাপ্রাণ্য হয় সেই দেশের উন্নয়ন কতটা সম্ভব? বাঙালিদের যে অংশ নিজদেশের হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া চায়, তাদের হিন্দু। ওই নামে যে ধর্মের কথা তারা বলে সেটা কে চালু করেছিল? কয়েকজন দেবদেবীর মূর্তি এবং জুড়িবা মায়ায় তাঁর কণি নিয়েছিল। সেটা যে ধর্ম নয় তা বিবেকবান অনেক বলেও বাঙালিকে বোঝাতে পারেন নি। যাত্রা এই কলঙ্কট করতে পারত তারা স্বাধীর কারণে হিন্দুপ থেকেকে। নিজদেশের ভোট কমে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চায়নি রাজনৈতিক দলগুলি। একই কারণে অনেককাল মেয়েদের রাজনীতিতে অংশ নিতে দেয়নি তারা। তারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন মাতঙ্গিনী হাজার কোনওরকমে ছিটকে জায়গা করে নিয়েছিলেন কিন্তু ক্ষুদ্রিরাম থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত পুরুষদেরই নামাবলি সাজানো। সূর্য সেনকে যে মহিলারা সমর্থন করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের উল্লেখ করাটিই হেঁকে করে থাকে। আর এখন মহিলা ভোটারদের সমস্ত করার জন্যে দলের উচ্চপদে বা মন্ত্রিসভায় দু-একজন মহিলাকে জায়গা দেওয়া হয় টুটে ভগ্নমান্য বানিয়ে। একই ধর্মের বৃহৎস মানু্যের কাছে হুনমান পবনদেবের মর্যাদা পায় অথচ সেই একই ধর্মের অন্য ভাষাতান্ত্রী মানু্য তাকে কলা খাওয়ানোর রসিকতায় সীমাবদ্ধ রাখে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে এই অসাড় তথাকথিত হিন্দুধর্ম নামক অভ্যেসটিকে ত্যাগ না করলে বসনারীর পটশিববর্তন কখনও হবে না।

লেখাটি ছাপা হল অলিখিত। এবার বিজ্ঞাপিত হয়েছিল বিষয়। ঢেউ উঠল সহজেই। একদল নিম্নায় মুখর হলেন। মৌলবানরা নেচেড়ে বসলেন। দেখা গেল শিক্ষিত বঙ্গ সমাজের অনেক মানু্য, খাঁর প্রগতিশীল হিসাবে নিজাদের প্রতিষ্ঠিত কলহেমনে তাঁরাও এই বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারছেন না। প্রতিপক্ষের বন্যা বেয়ে গেল। নারীর সনাতন ছবিটিতে কালি মাখানোর এই অপদানের বিরুদ্ধে তাঁরা কলম ধরলেন। নারী মানে জননী, তাকে দেবী হিসেবে দেখেছে হিন্দুধর্ম। বা শব্দটির মধ্যে বিশ্বের তারত শ্রদ্ধা নিহিত। চপলমতি কোনও যুবতীর বয়োদগতিতে সেই চিরকালীন ছবি ন্মান হতে পারে না।

মোহরের তৃতীয় লেখা ছাপা হল। নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধু। এবং এই লেখাটি রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের ষোড়শের বাঁধ ভাঙল। মোহর লিখেছিলেন নারীকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে কখনও কাণ্ডও মা, কখনও মেয়ে কখনও শ্রী। এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো না পারলেও সে মা অথবা মেয়ে থেকেই যাবে কিন্তু শ্রীরী কন্যা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। যেহেতু সে কাণ্ডও ওরসে এবং গর্ভে জন্মেছে তাই ভূমিকার ভূমিকা তাকে পালন করতেই হবে যদি সেই জন্মদাতা বিপরীত রেকের মানসিকতার হন তা সত্ত্বেও। একইভাবে গর্ভজাত সন্তানকে সে অমান্য করতে পারে, অস্বীকার নয়। কিন্তু নারীর বধু নিজে রাজত্ব করার দিন শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু মেয়েদের মত্ৰ বা সেই মানে ডিরকালর বৈশ্যাবৃত্তির বড় লেখা এখন সেটা ভাবলে ভুল হবে। এখনও, এই চুরানবই সালে, প্রাণ্ডবক্ষ্যক কন্যাসন্তানের ফটো পাঠান পিতা বিজ্ঞাপনের উত্তরে। তিনি একবার ভেবেও দ্যাকেন না তাঁর মেয়ের কণি যেসব অজ্ঞানা তাদের মানু্যের হাতে পড়েছে তারা কিসকম লুচেরা দিয়ে করছে? কেউ চোখ মুখ নিয়ে মন্তব্য করলে, কেউ গায়ের রং কেউ বা শরীর। এই যে নাও গো আমার মেয়েকে নাও, নিলে সঙ্গে আরও

অমরা মুখার্জি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি মেয়েকে দেখতে এসে ওই বাড়িতেই উঠেছেন অথচ তাঁর এই আত্মীয়পুত্রের দর্শন একবারও পাননি। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি।

লোকটি হাত নাড়ল, 'ওসব আত্মীয়তার ব্যাপার বাবা বুঝতেন। আমি তো আমার মামাতো ভাইবোনের নামই জানি না। যাকগে, জানেন নিশ্চয়ই বাড়ি বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে আমার মামলা চলেছে। আমরা দুজনই ওখানে থাকি না। ফরসালা হয়ে গেলে ওই বাড়ি বিক্রি করে দেব। তা আমাদের উকিল বলেছেন ও বাড়িতে কেউ যেন এখন বসবাস না করে।'।

মোহর বিছানায় শুয়ে লোকটিকে দেখছিল। তার মনে পড়ল গোলকপতির মৃতদেহ সংস্কার করতে লোকটি মদ্যপান করে এসেছিল। সে বলল, 'আপনারা তো ওখানে থাকেন না।'

'আমরা থাকি না কিন্তু অন্য কারও থাকা চলেবে না। জানি, বাবা থাকতে দিয়েছিল কিন্তু এখন অন্য অস্বাভা। তাছাড়া—'। লোকটি চুপ করে গেল।

অমরা মুখার্জি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে মেয়ে কোথায় থাকবে ভেবে পাচ্ছিলেন না। বললেন, 'তাছাড়া?'

'হ্যাঁ। এই যে মারপিট হয়ে গেল, কি কারণে হল জানি না, কিন্তু যারা মেরেছে তারা মুক্তারামবাবু শ্রুটি গিয়েও শাসিয়েছে যে ওখানে আপনার মেয়েকে আর জায়গা দিলে লাশ ফেলে দেবে। বুঝতেই পারছেন, এরপর—'। লোকটি খুব অসহায় ভাব করল।

দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ ওদের বুঁজে পাচ্ছে না অথচ ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল। আপনারা ধানায় ব্যাপারটা জানিয়েছেন?'

'দূর। কে ঝামেলায় যায়। তার চেয়ে অন্য কোথাও চলে যান। আমরা যেতে বিপদ ডেকে আনতে চাই না। নমস্কার।'। লোকটি যেন এসেছিল তমনি বেরিয়ে গেল।

পুলিশকে জানানো হল ঘটনাটা। খবরের কারণে আবার জায়গা পেল মোহর। ততদিনে স্পষ্ট হয়েছে মৌলবাদী শক্তি মোহরের মুখ বন্ধ করার জন্যে এই কাজ করেছে। পুলিশ কমিশনার বলে ফেললেন 'কোনও দাগি অপরাধী নয়, বিশেষ এক ধর্মমন্সক রাজনৈতিক দল তাঁদের গোঁড়া সমর্থকদের উদ্বেজিত করেছে এই কাজ করতে। যেহেতু অপরাধীদের কোনও অতীত রেকর্ড নেই তাই ধরতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু ধরা হবেই।'।

লোকসভাতেও এই নিয়ে হট্টই হল। কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্যে একটি যবতীকে নমু করা হয়েছে কারণ সে মহিলাদের হয়ে কথা বলতে চেয়েছিল। সামাজিক ক্রাতি-বিদ্ভূতি এবং অসঙ্গতি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল লেখার মাধ্যমে। ভারতবর্ষের প্রতিটি শিক্ত মানুষ মোহর মুখোপাধ্যায়ের নাম জ্ঞেবে গেল।

ফাইনাল পরীক্ষা সামনে। অমরা মুখার্জি ভেবেছিলেন এখন মোহরের মানসিকতা পরীক্ষা দেবার মতো নেই। কলকাতায় থাকার জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তিনি মেয়েকে হলদপুরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোহর পরীক্ষা দেবেই। এবং একেবারে আকস্মিকভাবে সে সুজানের বাড়িতে জায়গা পেয়ে গেল পরীক্ষা পর্যন্ত।

সুজান এখন মডেল হিসেবে খুব নাম করেছে। বেশির ভাগ সময় বোম্বেতে থাকতে হয়। সেখানে বসে সে মোহরের খবর পেয়েছিল। কাজ শেষ করে কলকাতায় এসে নার্সিংহোমে যেদিন দেখা করতে এল সেদিনই মোহরকে ছেড়ে দেবার কথা। সবে শুনে সে নিজেই প্রস্তাব দিল ওকে সন্টলেকে নিয়ে যেতে চায়। মোহরের আপত্তি ছিল না। দীপ্ত অন্য কোনও ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মেনে নিল যদিও নিজের অক্ষমতা তাকে খুব যন্ত্রণা পেলাম না।

অমরা মুখার্জি ফিরে গেলেন। সুস্থ হলেও বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল মোহর। সুজানের সাজানো বাড়ি থেকে বের হতে চাইত না সে। এবং এই সময় পরীক্ষার জন্যে তৈরি হবার ফাঁকে ফাঁকে সে তার পরের লেখাটি তৈরি করল। লেখাটির নাম মেয়েদের শরীরের গঠন এবং প্রকৃতি।

পাঠানোমাত্র ছাপা হল সেটা। আর একটা ডেউ উঠল। মুক্তারামবাবু শ্রুটি সে থাকে না তবু লোকটা বোমা পড়ল সেখানে। পত্রিকা পোড়ানো হল শেয়ারদা স্টেশনে, বাণবাজার শ্রুটিতে পুলিশ আর কিছু অপরাধীকে হাতেনাতে ধরতে পারল। তাদের একজন পুলিশকে বলল, 'লুফ মানুষের কয়েক হাজার বছরের বিশ্বাসকে একটি চপলমতি যুবতী ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে এ হতে পারে না। ওইসব লেখা পড়ে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলেই প্রতিবাদ করছে।'।

সমর্থনে এগিয়ে আসল কিছু নারী মানুষের কলম। রামচন্দ্র দশরথের সন্তান ছিলেন কিনা তা নিয়ে এখন আমরা ভাবতে চাই না। তিনি মহান মানব ছিলেন যিনি ক্রমশ দেবতার পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছেন। সীতাকে মাটি থেকে কুড়িয়ে পাওয়াটা বড় কথা না তাঁর জগজ্ঞানী রূপটা? যারা পোকা বাঘেতে চায় তারা সনাতন ভারতবর্ষকে বিশপ দেখতে ইচ্ছুক।

মোহর পরীক্ষা দিল পুলিশ পাহারায়। পরীক্ষার পরেই ওর প্রথম বইটি প্রকাশিত হল। কলেজ শ্রুটির এক নামী প্রকাশক মোহরের প্রকাশিত লেখাগুলো একসঙ্গে বই করে ছাপলেন। বইয়ের নাম আত্মসম্বন্ধ। কিন্তু এত দ্রুত ওই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাবে প্রকাশক ভাবেননি। এই প্রথম একটি প্রবন্ধের বই, যাতে গল্প-উপন্যাসের মজা নেই, শব্দ থেকে গ্রাম্যক্কেল মানুষের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। এক মাসের মধ্যে বইটির দশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দামের বইটির সম্মান-দক্ষিণা বাবদ মোহরের রোগ্যার পর্যতাংশ ছাড়ার ঢাকা।

দীপ্ত আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। এক দুপুরে সৌমিত্রা সাক্ষী হিসেবে সই দিল। ওরা বিয়ে করল। ব্যাপারটা দীপ্ত জানিয়ে রেখেছিল বাড়িতে। বিয়ের আগে মোহর অমরা মুখার্জির অনুমতি নিয়েছিল। অন্তরালে নিয়ে হুজু ছিল হিমুদেবের একমাত্র মেয়ের বিয়ে বেশ দুঃখান্বিত সকে বোনে। কিন্তু মোহরের প্রবল আপত্তির কথা তিনি জানতেন। স্ত্রী কৈনে ভাসালেও মেয়ের ইচ্ছেটাকেই মেনে নিলেন। দীপ্তকে চিঠি লিখলেন অবিলম্বে যেন মোহরকে সঙ্গে নিয়ে হলদপুরে চলে আসতে।

মোহর মুখার্জি এ বাড়ির বউ হয়ে আসছে এবং সেই কারণে সনাই বাজছে না, শব্দধ্বনি হচ্ছে না, ম্যারাপ বাঁধা হলেন, কাউকে নেমন্ত্রণ করেননি এরা—এমন একটা গল্পো পাড়ায় চাটুর হয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা বয়সি নীন্দ্যামির সীমা কাটা উঠি। পুরুষের মন্তব্য করলেন, কালসাপ ঘরে এলে গৃহস্থের ঘুম হয় না। কিন্তু ট্যান্সি থেকে যখন দীপ্তর সঙ্গে মোহর নেমে এল তখন সবাই ভিড়ি জমিয়ে দেখতে এলেন। এমন বিখ্যাত হয়ে ওঠা একটি মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে আসছে বলে কিছুটা ঈর্ষাও চোখেখুঁছে ছিল। অকিন কাছারিতে গিয়ে তাঁরা অবশ্য গর্ব করবেন আমাদের পাড়ার বউ মোহর মুখার্জি।

দীপ্তর মা বোনরা যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করলেন। যে মেয়ের প্রায় নব্বু শরীর রাস্তার লোকজন দেখেছেন, যে মেয়ে কেলই বিস্ত্রাহের কথা বলে, পালক ঘরের বউ হিসেবে কল্পনা করতে ওঁদের বাধছিল। কিন্তু একমাত্র রোজগেরে ছেলের জন্দের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কোনও ছিল না। মোহরকে দীপ্তর জন্যে বরাদ্দ ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের দেওয়ালে শেষ রং কাবে করা হয়েছে কেউ জানে না। বিছানার চান্দরটি শুধু নতুন, পাঁচগুলো ফাঁসে গেছে কিছু জায়গায়। মোহর ঘরের কোথাও একটা ফুল দেখতে পেল না। দীপ্তর মা বললেন, 'আর কি করা যাবে। ঘরের বউ হয়ে যখন এসেছে তখন সব মানিয়ে নিতে হবে তোমাকে। লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘর সাজায় আমরা তার সই সুযোগ পেলাম না।'

দীপ্তর বোন বলল, 'কার সামনে এসব কথা বলছ মা, এখনই কথা শুনবে।'। 'শোনালে অন্য কেব? তোঁর বিয়ের সময় কি বরের বাপ শীঘ্রা সিঁদুরে নেবে?'

মোহর কথা বলছিল না। চুপচাপ বাটের পায়ে ঠাড়িয়েছিল।

দীপ্তর মা বললেন, 'ওর একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করে। নিজের বাড়ি। বিধবা শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। সেজ বড়ির অসুখ, মরল বলে। একেবারে সোনার চাঁদ ছিলে। কিন্তু বিশ হাজার নগদ আর দশ ভরি সোনা, একটা রঙিন টেলিভিশন চেয়েছে। বুঝলে?' ছেলেকে বললাম, শুনে তার মুখ হাড়ি হয়ে গেল।

'এখন কেউ নগদ চায়?' বিস্ময়ে বলে ফেলল মোহর।
'কোন জগতে থাকো তুমি? ঘরে বসে অপনমনে বই লিখলে কি এসব জানা যায়? থাকবে, শুনলাম, বই লিখে অনেক টাকা পাছ। ছেলে করা আর তোমার করার মধ্যে তো কোনও পার্থক্য নেই। এটাই ভেবে দেখো।' শাশুড়ি বললেন।

জবাব ঠেটে এসে গিয়েছিল কিন্তু কোনওমতে সামলে নিল মোহর। আজ বউ হিসেবে এ বাড়িতে প্রথম দিন। প্রথম দিনেই শত্রুতা তৈরি করার কোনও মানে হয় না।

ছোটবোন বলল, 'কাল তুমি রান্না করবে বউদি। তোমার হাতের রান্না খাব।'

মোহর হাসল, 'আমি কখনও রান্না করিনি।'

শাশুড়ি বললেন, 'ওমা! একি কথা! তোমার মা রান্না শেখাননি?'

'বলেছিলেন, আমার রান্না করতে আগ্রহ হয়নি।'

'একি বলছ? বাড়ালি মেয়ে রান্না জানে না, স্বামীকে খাওয়াবে কি?'

'রান্নাটা যে শুধু মেয়েদের করতে হবে তা তো কোথাও লেখা নেই। স্বামীরাও স্বত্বীকে রান্না করে খাওয়াতে পারে।'

'ব্যটিছেলে রান্না করবে? খোকা কখনও রান্নাঘরে ঢুকেছে?'

'পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত ঐশ্বর্যই কিন্তু পুরুষমানুষ।'

'ওসব বুঝি না বাবা। রান্না না করলে খাবে কি? চিরকাল তো আমরা দাসীস্বামী হয়ে থাকব না।'

ওকটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নইলে হোটেল তো আছেই।

গুঁটা কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। মোহরের মনে হল শেফার্ডস সের শত্রুতাটা শুরু করেই ফেলল। দীপ্তকে বলতে হবে কালই একটা রান্নার লোক জোগাড় করতে। অহম্মহিলেদের জানানো দরকার শুধু রান্না করার জন্যে তাঁরা পৃথিবীতে জন্মাননি।

সজ্জাবেলায় দীপ্ত এল। সঙ্গে কিছু ফুল আর খাবারের প্যাকেট। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। বই পড়ছিলাম।'

'ওদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে?'

'হয়েছে। তবে বেশি না হওয়াই বোধহয় ভাল।'

দীপ্তর কপালে ডাচ্চ পড়ল, 'কেন? ওরা কিছু বলেছে?'

কিছু বলেনি। 'হাসল মোহর, 'আচ্ছা, তুমি কোথায় বসে লেখো?'

'আমার আবার লেখা। এই খাটে শুয়েই যা লেখালেখি।'

'এভাবে বলছ কেন? তোমার কবিতার বই বের হলে দেখো ভাল বিক্রি হবে।'

'ছাপবে কে?'

'সুধীরবাবুকে বলেছি। উনি রাজি হয়েছেন।'

'না বললেই পারতে। তুমি এখন ইটকেক তাই তোমাকে সন্তুষ্ট করতে উনি ছাপতে চেয়েছেন। মনে মনে আমাকে গালাগালি দিয়েছেন।'

মোহর দীপ্তর দিকে তাকাল, 'মামনের মনের কথা কি সহজে পড়ে ফেললে। এসব কমপ্লেক্স ছাড়ো। বই বের হলে দেখবে অন্য প্রকাশকরা তোমার কাছে আসবে।'

'মোহর। বাড়ালি কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে যায় বালক বয়সে কিন্তু পয়সা দিয়ে কবিতার বই কেনার লোক হাতে গোনা যায়। গদ্য লিখে একজন লেখক যা আয় করেন, সারাজীবন কবিতা লিখে একজন কবি তার ওয়ান পাসেন্টও রোজগার করেন না। প্রকাশকরা টাকার খলি নিয়ে আসবে আশা করলে গদ্য লিখত কবিরা কিন্তু তাতে পদ্য লেখার অস্বহ্যতা থাকত না।' দীপ্ত চুপে ছাট বোলাল, 'এক আধটা নতুন বিষয় নিয়ে গদ্য লিখলেই বিখ্যাত হওয়া যায়, কিন্তু কবি হতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয় অনেক সময় ধরে।'

'তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ?'

'ব্যঙ্গ করছি না। কিন্তু ব্যঙ্গ সহজে তুমি সাফলা পেয়েছ। ভয় এখানেই।'

মোহরের মাথা গরম হয়ে গেল, 'তুমি এত জেলাস ভাবেতো পারিনি দীপ্ত। লোক আমার লেখা পছন্দ করে সেটা আমার অপরাধ? আমি তাদের ডেকে ববব, দেখুন মশাই আমি মার চাটতে লেখা লিখেছি একবছরে, মার ক্লাস ওয়ানে পড়ি, দশ বছর পর স্কুল ফাইনাল পাশ করি তারপর আমাকে লেখক বলেবন, এই তুমি চাও? তোমার দোষ নেই। এ বাড়ির পরিবেশে বড় হয়ে তোমার মনটা ছোট হয়ে গেছে।'

দীপ্তর মুখ কঠিন হয়ে গেল। নিজেকে সামলালে না। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'আজকের প্রথম তুমি এ বাড়িতে এসেছ, তাই আর কথা বাড়ানলাম না।'

দীপ্ত বেরিয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মোহর। হঠাৎই তার মনে হতে লাগল আর কিছু করার নেই। ভুল যা করার তা করে ফেলেছে। দীপ্তর যে দিকটা তাকে আকর্ষণ করে তাকে পেয়ে গিয়ে আর একটা দিকেই অন্তিভুক্ত সে ভুলে গিয়েছিল। এক সঙ্গে বাস করতে হলে প্রতিপদে সেই দিকটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। সেই করার আগে এই সন্ধ্যাতার কথা তার চিন্তা করা উচিত ছিল। বন্ধু হিসেবে যাকে চাওয়া যায় তার সঙ্গে একধরে সারাজীবন কাটানো যে বেশির ভাগ সময় সম্ভব নয় এটা যে কেন ভাবেনি।

এই ঘরে একটা জানলা আছে। কিন্তু তার সামনে দাঁড়ালে আকাশ দেখা যায় না। একেবারে গায়ে পাশের বাড়ির নোনাধরা দেওয়াল ব্যাচাসের পথও আটকে রেখেছে। ঘরে কোনও টেবিল চেয়ার নেই। চেয়ারে বসে লেখার অভ্যাস হয়েছে তার। এখানে থাকতে হলে চেয়ার টেলি আনতে হবে। মোহরের নজর প্যাকেটগুলোর ওপর পড়ল। ফুল কিনে এনেছিল দীপ্ত কিন্তু মোড়ক খোলা হয়নি। কথার পেছনে কথা বলে মেজাজ নষ্ট করে চলে গেছে। কোথায় গেল বলে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। সে খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দীপ্তর ছোট বোন দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে প্যাকেটগুলো দিয়ে বলল, 'নাও।'

'এগুলো তো দাদা তোমার জন্যে এনেছে।'

'আমাকে তো সে কথা বলেনি। বলেছে সবার জন্যে। খেয়ে নিয়ো।'

'তুমি খাবে না?'

'নাঃ। আমার শরীরাটা ভাল নেই। বাথরুমটা কোথায়?'

'ওখানে।' একটা টিনের দরজা দেখিয়ে দিল মেয়েটি। প্রায়-অন্ধকার সেই ধরটিতে ঢুকেই মোহরের বাবার কথা মনে পড়ল। অন্নদা মুখার্জি বলতেন, 'একটি সন্তা মানুষ তার টয়লেট এবং বাথরুমকে শোওয়ার ঘরের মত পরিষ্কার রাখে।' বাবা যেন কখনও এ বাড়ির বাথরুমে না ঢোকে। ঢুকলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল মোহর। পাঠে স্পর্শ পেতেই চোখ বুলে দেখল অপরিচিত দেওয়াল, বিছনার চার, ছাদ। ধড়মড়িয়ে এটো বসতেই চোখ জুড়ে দীপ্তর মুখ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে সে আঁকড়ে ধরল দীপ্তকে। দীপ্ত চাপা গলায় বলল, 'ছাড়ো। কেউ দেখে ফেলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সে শিখিল হয়ে গেল। কোনও কামনার তড়নায় নয়, চট করে ঘুম ভাঙায় অচেনা পরিবেশ তাকে ভীত করেছিল বলেই সে চেনা মানুষকে জড়িয়ে ধরেছিল এটা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছে হল না।

‘ঘুমিয়ে পড়েছ, খাবে না?’

‘ভাল লাগছে না।’

‘শরীর খারাপ?’

‘না। তুমি খেয়ে নাও।’

দীপ্ত বেরিয়ে গেল। এই যে তাকে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না দীপ্ত এটা ভাল লাগল মোহরের। ছেলেবেলা থেকেই তার খেতে ইচ্ছে না করলে মা জোর করত না। বাবা বরং তাকে, মানুষ না খেলে চট করে মরে না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে খাওয়ালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশি জোর করলে যে মেজাজ নষ্ট হয়ে যায় এটা মা জানত। কলকাতায় আসার পর জোর করার লোক কাছে ছিল না, সেটা একটা বাচোয়া। দীপ্ত যে পাতি বাঙালির মত খাও খাও করেনি এটাই আজকের লাভ।

প্রায় নিশ্চিহ্ন রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে দীপ্ত বলল, এখনো তোমার খুব অসুস্থিই হচ্ছে, না?’

‘হবে না যদি বাথরুমটা সারাও।’

‘পুরনো বাড়ি। সারাতে গেলে অনেক খরচ।’

‘ভদ্রভাবে থাকতে গেলে খরচ করতেই হবে। তাছাড়া একটা রান্নার লোক চাই।’

‘কেন? মা কড়িকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে না।’

‘দেবেন। দাসীবাতি হয়ে উনি কতদিন রান্না করবেন?’

‘কি যা তা বলছ! রান্না করটা মায়ের নেশা।’

‘এসব বলে মেয়েদের আর কতকাল ভুলিয়ে রাখবে?’

‘আসলে মায়ের হাতের রান্না ছাড়া খেতে ভাল লাগে না।’

‘এসপুয়েট করার এর চেয়ে সহজ পথ আর নেই।’

‘ঠিক আছে। কাল থাকে জিজ্ঞাসা করব। যদি রাজি হন—।’ দীপ্তর হাত মোহরের সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মোহর বলল, ‘একমিনিট।’

দীপ্তর হাত থেমে গেল, ‘কি হল?’

‘মাকে যেমন জিজ্ঞাসা করবে তেমনি আমাকেও কি জিজ্ঞাসা করেছ?’

‘কি জিজ্ঞাসা করব?’

‘আমার ইচ্ছে আছে কিনা।’

‘আমি তোমাকে আদর করব না?’

‘করবে। কিন্তু আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে চাপ দিচ্ছ তাকে আদর করা বলে নাকি? কে শেখাল তোমাকে?’ অঙ্কুরের হাসল মোহর।

‘আই লাভ ইউ মোহর। এসব কথা বলো আমি জানি না।’

দীপ্ত মোহরকে বুকের ভেতর নিয়ে নিতে চাইল। এবং ওইভাবে মিশে যেতে যেতে হঠাৎ হঠাৎই মোহরের মনে হল দীপ্ত খারাপ পাড়ায় গিয়েছিল। অন্তত একবার যে গিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দীপ্ত যতই বন্ধু ওর ভূমিকা ছিল একজন দর্শকের তবু সেটাকে সে সরলভাবে নেবে কি করে? এইসব বাজারি মেয়ের কাছে গিয়ে প্রাণেশের শরীরে অসুস্থ এসেছিল। প্রাণেশ সেই ব্যাপারে খোলাখুলি স্বীকার করেছিল। এখন প্রাণেশ এবং দীপ্ত হঠাৎই একাকার হয়ে যেতে লাগল। এবেকার শেষ মুহূর্তে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিল মোহর। হতভম্ব দীপ্ত আত্ননাদ করল চাপা স্বরে, ‘কি হল?’

‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।’

‘কি পারছ না?’ মাথামুণ্ড বুঝতে পারছিল না দীপ্ত।

‘তুমি সোনাগাছিতে গিয়েছিলে।’

‘ও, সে তো অনেকদিন আগের কথা।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু তারপর যে আর যাওনি তার প্রশ্ন কোথায়?’

‘আশ্চর্য! আমি তোমাকে কথা দেবার পর আমার যেতে পারি বলে ভাবছ?’

‘আমি জানি না।’

‘ও মোহর। প্লিজ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। তুমি তো সব ভুলে গিয়েছিলে।’

‘হ্যাঁ। আমার মনে আসেনি কারণ তারপর আমরা এসব কখনও করিনি।’

অসহায় ভাবে দীপ্ত বলল, ‘আমি একবারই গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে এবং গল্প করে চলে এসেছি। জাস্ট একজন দর্শক।’

‘আমি জানি না।’

‘আমি আর কখনও যাইনি মোহর।’

‘হতে পারে।’

‘তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস না থাকলে—।’

‘ঠিক আছে। তুমি ওখানে কিছু করানি?’

‘না।’

‘যদি করে থাকো তাহলে তোমার অসুখ হতে পারে।’

‘আমার কোনও অসুখ নেই।’

‘আমি পড়েছি। একটা ঘটনার পর কৌতুহলে এ ব্যাপারে কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়েছিলাম। একবার অসুস্থ হলে কি লক্ষ্যণ থাকে তা আমি’

জানি আমি অসুস্থ না হলে লক্ষ্যণ থাকবে কি করে?’

‘আমি নিশ্চিত হতে চাই।’

‘আমি যে বলছি তাতে তুমি নিশ্চিত নও।’

‘সত্যি কথা বললে দরব না। আমার এক মন তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইছে, কিন্তু আরেক মনে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।’

দীপ্ত অঙ্কুরের মোহরের দিকে তাকাল। একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে শব্দ করে। তারপর বলল, ‘ঘুমিয়ে পড়ো।’

‘আমার ঘুম আসবে না।’

‘কেন?’

‘আমি তোমাকে চাই। কিন্তু সন্দেহটাকেও হাড়তে পারছি না।’

‘তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।’

আলা জ্বলল মোহর। দরজা জানলা বন্ধ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে সশব্দে। যেন করবেতার গতি বুঝে নিজের ভাগ্য জেনে নিচ্ছে এমনভাবে অজ্ঞিত বিদ্যা যাচাই করল সে। তারপর সোজা হয়ে ফ্যাসক্যাসে গলার উত্থাপন করল, ‘তুমি অসুস্থ হয়েছিলে।’

চোখের ওপর হাত রেখে গুয়েছিল দীপ্ত। কোনও কথা বলল না। প্রচণ্ড জোরে ওর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল মোহর। বল, আমি জ্বল বলছি!’

‘আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।’

‘কিন্তু তুমি অসুস্থ হয়েছিলে।’ পাগলের মত দেখাচ্ছিল মোহরকে।

‘আই ওয়াজ ড্রাক্স। আমার কোনও চৈতন্য ছিল না। আমি কি করেছি, আমাকে নিয়ে কি করা হয়েছে তখন আমি বুঝিনি।’ হাত সরাসরি না চোখের ওপর থেকে দীপ্ত।

‘তাহলে এতক্ষণ আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছিল কেন?’

‘অতীতের একটা দিনের ভুল, যা প্রায় আমার অজ্ঞাতেই হয়ে গিয়েছিল—’

‘আর ব্যাখ্যা কারো না। তুমি অসুস্থ হয়েছিলে জানার পর তোমার সঙ্গে আমি শুতে পারব না।’

‘কিন্তু আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।’

‘কাল তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। তোমার ফিট সার্টিফিকেট উনি দিলে আমার সন্দেহ দূর হবে। আমার মনে হয় আজকের রাতটা আমাদের আলাদা ঘুমানো উচিত।’

‘আলাদা? এখন আমি বাইরের ঘরে গিয়ে শুলে তোমার সম্মান বাড়বে?’

‘আমার একার কেন, তোমারও তো। আর এটাও তাম্বব ব্যাপার স্বাধীনতা একসঙ্গে না শুলে পাঁচভুতে কান্নাকাটি করবে। তাছাড়া ওরা যদি শোনে তোমার অসুস্থতা নেই এটা জানার জন্যে আমরা আজ রাতে আলাদা শুয়েছি তাহলে কিছু বলবেন না?’

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা চামর টেনে নিয়ে ঘেঁষেতেই শুয়ে পড়ল দীপ্ত। তার লেখা কোনও কবিতায় এমন অনুভূতি সে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, ‘আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঠরকন ও সব অসুখ করেনি। এরকম সন্দেহ মাথায় ঢুকল কি করে?’

মোহর দীপ্তর দিকে তাকাল। গম্ভীর মুখে বসে আছে দীপ্ত। কিন্তু সে বইতে যেসব লক্ষ্যের কথা পড়েছিল তার কিছু কিছু গতরারে দেখতে পেয়েছে। মোহর বলল, ‘আপনি বলছেন?’

ডাক্তারবাবু আবার হাসলেন, ‘একশ ভাগ।’

দীপ্ত তাকালেন, ‘মনে হচ্ছে তুমি হতাশ হলে।’

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি রেডলাইট এরিয়ায় গিয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ। অনেকদিন আগে। গিয়েছিলাম দর্শক হিসেবে। ফিরেও এসেছিলাম সেইভাবে।’

‘মিথ্যা বোলে না।’ মোহর প্রতিবাদ করল।

‘সেটা গতকাল বলেছি। যখন তুমি আমাকে একদম বিশ্বাস করছিলে না। মনে হয়েছিল আমি অসুস্থ জানলে তোমার ইগো স্যাটিসফায়ড হবে।’

‘অবুত!’ কোনও মতে উদ্ধারণ করল মোহর।

দীপ্ত টাকা বের করে একটা পেপার ওয়েটের তলার রেখে উঠে পাঁচভুতেই মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘আজ্ঞা, কোনও অসুস্থ মানুষের সম্পর্কে আসার পর কতদিন বাদে সেই রোগের প্রকাশ পায়?’

‘এটা জানতে দেরি হয় না। খুব দ্রুত অসুস্থ জানান দেয়।’

‘তার মানে তিন চার অথবা দশ বছর বাদে এটা মাথা চাড়া দেয় না?’

‘সাধারণত নয়। তবে অনেক সময় ব্যতিক্রমও দেখা যায়।’

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসার পরে মোহরের মনে পড়ছিল প্রাণেশের মুখ। প্রাণেশ তার শরীরে কি দিয়ে গেছে তা এখনও জানে না সে। এতদিন তার কোনও অসুবিধে হয়নি। অসুস্থতার কোনও আভাসও পায়নি। কিন্তু পরে, অনেক পরে যদি কিছু হয়? একবার পরীক্ষা করলে কেমন হত? ব্যাপটা কি দীপ্তকে বলবে? বলা উচিত?

দীপ্ত ঘড়ি খেলল, ‘কফিহাউসে গেল হয়। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে।’

‘না। বাড়িতে চলে।’

‘এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে কি করব?’

‘তোমার সঙ্গে কথা আছে।’

‘তাহলে এখনই কোথাও বসি।’

‘না। বাড়িতে যাব।’

‘কিন্তু আমার আঙ্গকে ড্রিং করতে হচ্ছে করছে।’

‘সেটা বাড়িতে বসে করো।’

‘পাগল। ও বাড়িতে সম্ভব নয় তা তুমি জানো।’

‘আশ্চর্য। তোমার বেতরুমে কোনও প্রাইভেসি থাকবে না?’

দীপ্ত কথা বাড়াল না। একটা টায়রি নিয়ে ওরা ফিরে আসছিল। মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘বাড়িতে তো কিছু নেই, কিনবে না?’

‘না।’

এত তাড়াতাড়ি ছেলে বউকে নিয়ে ফিরবে আশা করেনি বাড়ির লোক। শাশুড়ি দরজা খুলে বললেন, ‘ও তুমরা! আমি ভাবলাম খেয়েদেয়ে আসবে।’

দীপ্ত বলল, ‘আমরা সেকথা তো বলিনি।’

‘বলিসনি। কাল বাইরে থেকে খাবার আনলি, তোর বউ খেল না। আজ দুপুরেও যেন কোনও মতে গিলল। আমাদের রান্না নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি।’

‘প্রথম প্রথম ওরকম হয়। আমরা তরিতরকারিতে মিষ্টি খাই, ওরা খায় না।’

মোহর চুপচাপ শুনছিল। এই ভ্রমহিলা কদিনে নর্মাল গলায় কথা বলবেন। শাশুড়ি বললেন, ‘আজ তোর মায়া এসেছিল। বলল, দীপ্ত তোমার বিয়ে করল কিন্তু একটা সামাজিক ব্যাপার তো আছে। পাঁচজনকে ডেকে বউভাত গোছের কর একদিন। আমার তো সামর্থ্য নেই। তাকে কথাটা জানিয়ে দিলাম।’

‘তুমি কি চাও?’

‘আমার চাওয়ার কিছু নেই। তুই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিস, যা করার তুই করবি। ভ্রমহিলার কথা শেষ হওয়ায় মোহর নিজের ঘরে চলে এল। সে ঠিক করল আজ কোনওভাবে কগড়া করবে না। ভ্রমহিলা তাঁর এতদিনের ধ্যানধারণা এক কথায় বদলাতে পারেন না। সে চেষ্টা করলে দূরত্বটা বাড়ি ছাড়া কমবে না।

রাতের খাওয়ার নামমাত্র। এ বাড়িতে টেলিভিশনের ব্যবহার নেই খাওয়ার সময়। স্নাটর সঙ্গে আলুর দম চমৎকার জমে যদি সেটা খালখাল হয়। এই ঘটি বাড়িতে মিষ্টির প্রাবল্য এত বেশি যে আলুর দমও মুখে তুলতে অসুবিধে হচ্ছিল মোহরের।

দরজা বন্ধ করে সিগারেট খরিয়ে দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘আজ পত্রিকার অফিসে কি হল?’

‘আবার লিখতে বলেছে। সেইসঙ্গে একটা ভাল খবর আছে।’

দীপ্ত তাকাল। প্রশ্ন না করে খবরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

‘আমি বোধহয় একটা চাকরি পাইছি।’

‘তাই? বাঃ। ভাল খবর।’ দীপ্ত সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, ‘তখন কি বলবে বলছিলে?’

‘আপনি লোকটাকে দেখেছেন?’

‘না। দেখার সাধ নেই বাপু।’

‘খুকি ছাড়া আর কেউ দেখেছে?’

‘নিশ্চয়ই দেখেছে। পাড়ায় এসে যখন জিজ্ঞাসা করছিল—’

‘আপনার খুকিকে ডাকুন।’

শাশুড়ি চিংকার করে ডাকলে ছোট নন্দ ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

‘তুমি ছাড়া লোকটাকে কে কে দেখেছে?’

ঠোট ঝটল মেয়েটা, ‘আমার মনে নেই।’

‘শোন। আমার খোঁজে কেউ আসেনি। দুপুরে তুমি ধরা পড়ে গেছ বলে বাড়িতে ফিরে মিথ্যে

গল্প বানিয়েছি। মিথ্যে কথা শুনেলে আমার মেজাজ গরম হয়। গরম হলে কি করি তা আজ তুমি

জেনেছ। সত্যি কথা স্বীকার কর।’

‘ও মিথ্যে বলেছে। আমার মেয়েকে মিথ্যেবাদী বলছ তুমি?’

‘শুনুন। আপনার মেয়ে আজ দুপুরে ভিক্টোরিয়াতে দুটো বদ ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে

গিয়েছিল। আমার চোখে পড়ায় ওকে বাইরে নিয়ে আসি। মনে হয় ও স্কুল পালিয়ে প্রায়ই এসব

করে। আপনি খোঁজ নিন।’ মোহর শান্ত হবার চেষ্টা করছিল।

‘ছি ছি ছি। তুমি ঘরে পড়ে আমার মেয়ের চরিত্র নিয়ে গল্প বানাচ্ছ?’

‘আমি সত্যি বলছি।’

হঠাৎ মেয়েটি ছুটে এল সামনে, ‘প্রমাণ কর, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি আজ

ছেলেদের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় গিয়েছিলাম।’

মোহর হঠাৎ অসহায় বোধ করল। কোন ছেলে তারা সে জানে না। সাক্ষী রেখে ওকে বাইরে

নিয়ে আসেনি সে। হঠাৎ তাদের অফিসের ড্রাইভারের কথা মনে পড়ল। গাড়িতে বসে নিশ্চয়ই

লোকটা সব দেখেছে। মোহর বলল, ‘ঠিক আছে। আমাদের ড্রাইভারকে ডেকে পাঠাচ্ছি।’

‘তোমাদের ড্রাইভারকে তো শিখিয়ে রেখেছে?’

‘ও ঠিক আছে। কাল তোমার স্কুলে যাব। প্রমাণ জোগাড় করতে বেশি দেরি হবে না

‘আমার।’ মোহর কথা শেষ করতেই শাশুড়ি তাঁর ছোট মেয়ের চুল মুঠোয় ধরলেন, ‘আবার

জুটিয়েছিস? কত করে নিষেধ করেছি, বুঝিয়েছি তবু খবাব শোধরল না। সে। কেঁদে ককিয়ে শাশুড়ি

‘মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা বলছে। বিবাস করো মা, ও আমায়ের শত্রু।’

আলো নিভিয়ে শুয়েছিল মোহর। তার কেবলই মনে হচ্ছিল বাইরের জীবন, চাকরি অথবা

ব্যাতি, তেতরের জীবন, নিজের মানসিকতা, কোনওটার সঙ্গে এ বাড়ির কোনও মিল নেই।

এখানে থাকলে সে ক্রমশ ছোট হয়ে যাবে। নটা নাগাদ দীপ্ত বাড়ি ফিরল। সে ফিরতেই শাশুড়ির

গলায় হাড়মডি কান্না শুনতে পেল মোহর। বিছানা থেকে উঠল না সে। কেঁদে ককিয়ে শাশুড়ি

ছেলের কাছে কি বলছেন তা শোনার প্রবৃত্তি হল না তার।

দীপ্ত ঘরে ঢুকল বানিক বাদে। ঘর অন্ধকার দেখে জিজ্ঞাসা করল, ‘ঘুমিয়ে পড়েছ?’

‘না।’

‘এসব কি হচ্ছে?’

‘তোমার মায়ের দর্শন শুনে এলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, আমি হয়তো উশ্টো বলব।’

‘তোমার বক্তব্যটা শোনা যাক।’

‘বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু না বললে ভুল করা হবে।’ মোহর উঠে বসল।

আজকের দুপুর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সে মেঝেতে দেখেছে সেইভাবে বলতে লাগল। তার

গলায় স্বর স্বাভাবিক ছিল না। এবং সে শেষ করা মাত্র বাইরের বারান্দায় চিংকারটা ছিটকে উঠল, ‘মিথ্যে কথা। আমার মেয়ে যদি ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে থাকে তাহলে তুমি সেখানে কি করতে গিয়েছিলে? ভরদুপুরে সেখানে তোমার কি কাজ ছিল? ঘরে একলা পেয়ে আমার ছেলের মন তুমি ঘুরিয়ে দিতে পারো না।’

দীপ্ত দরজার সামনে গেল, ‘মা, কি হচ্ছে? চুপ করো। পাড়ার সবাই শুনছে।’

‘পোনার আর বাকি কি আছে? আমি তো কান পাততে পারি না। তোমার বউ প্যান্ট সার্ট পরে কেন? ছেলেদের মত চুল ছাটে কেন? ব্যাটাছেলের মত গটগটিয়ে ছাটে কেন? কার ঘরের বউ এমন কাঠোঁটা হয় রে?’

‘কে কি বলল তাতে কান দেবে কেন? নিজেরা মিলেমিশে থাকো। যাও, ঘরে যাও। খুকি কোথায়? সে আমার সামনে এসে বলুক ভিক্টোরিয়ায় যায়নি।’

‘আমি তাকে মা বলার বন্ধেছি তুই আর বলিস না।’

‘তুমি আর প্রশ্ন দিয়ে না মা। হঠাৎ এমন বিপদে পড়বে যে কুল থাকবে না।’ দীপ্ত ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বালল, ‘তোমার অফিসের কোনও সহকর্মী আসতে পারে। আজকাল কে কি করবে ফোরকাস্ট করা সম্ভব নয়।’

‘দীপ্ত। আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়।’

‘তার মানে?’

‘নতুন কোনও ফ্ল্যাট দ্যাখো।’

‘ইমপসিবল। এদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘আমি এতদিন এ বাড়িতে অনেক অপমান চুষাপচুষ সহ্য করেছি কিন্তু আজ যা হল তারপর এখানে থাকলে নিজেও একটা কীট বলে মনে হবে।’

‘ওঃ। ইগনোর করো। এদের মাথার ঠিক নেই।’

‘হ্যাঁ। এখানে থাকলে আমারও মাথা ঠিক থাকবে না।’ জোর গলায় বলল মোহর, ‘সামনের

মাসেই একই ভদ্রভাবে থাকার জায়গা পেতে হবে।’

‘দ্যাখো মোহর, এদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘তোমার স্ত্রীর সম্পন্ন আগে না এখানে এদের সঙ্গে থাকটা জরুরি?’

‘দুটোই।’

‘দুটো যখন তুমি পারছ না তখন আমরা চেষ্টা করবই।’

‘তোমার মাথায় কেন ঢুকছে না এ বাড়িতে এখন আমি একমাত্র রোজগার করি। এরা আমার ওপর নির্ভর করে আছে। এরা অশিক্ষিত, নির্বোধ কিন্তু আমার মা বোন। আমি ওদের হঠাৎ পাথে

বসিয়ে চলে যেতে পারি না।’

‘তোমার চাকরি পাওয়ার আগে এদের চলত কিভাবে?’

‘বাবার রেখে যাওয়া টাকা ভাঙিয়ে। জামাইবাবুও সাহায্য করত।’

‘তুমিও করবে। তোমার মাইনের টাকার সমস্যাটা এখানে দিয়ে দিয়ে। আমার টাকাঘর ঠিক

ম্যানেজ করে নিতে পারব। ঠিক আছে?’

‘তুমি এখন রেগে আছ, পরে কথা বলব।’

‘নো। আমি রেগে গেলেও নর্মালই আছি।’

‘বেশ। ব্যাপার লাগলেও একটু মানিয়ে নাও।’

‘দীপ্ত, আমরা বিয়ে করেছিলাম একসঙ্গে থাকব বলে। তোমার মত পুরুষের স্ত্রীকে বঞ্চিত না

না স্ত্রীকে, এটা তোমাকে ঠিক করতে হবে।’

দীপ্ত জবাব দিল না। সেটা লক্ষ্য করে মোহর বলল, 'ইন দ্যাট কেস আমাকে একাই যেতে হবে। তুমি তাহলে এদের নিয়ে থাকো।'

'কি যা তা বলছ?'

'আমি স্পষ্ট বলছি। আমি যখন ওদের আর সহ্য করতে পারছি না তখন এ বাড়িতে থাকব কি করে? তুমি যখন ওদের ছেড়ে যেতে পারবে না তখন আমাকেই একা যেতে হবে। এর মধ্যে কোনও গোলমাল নেই।'

'মোহর, লোক তোমার নিদ্দে করবে।'

'এতে আমি ধাক্কালা থেকে অভ্যস্ত। কি বলবে, মেয়েটা এত বদ যে শাওন্ডি ননদের সঙ্গে মনোতে পারল না। বদ বলেই স্বামীও সঙ্গে গেল না। এর বেশি কিছু বললেও আমার আপত্তি নেই। আলোটা নেভাও।'

দীপ্ত এগিয়ে এল, 'আমি মাকে বলব যাতে একটু ভাল ব্যবহার করেন।'

'দ্যাখো, তোমার মত মাথাপোষা বালকের সঙ্গে কথা বলতে আমার ধূগা হচ্ছে। তেমন্না স্ট্রীকে আপস করতে বল অথচ মা বোনকে সংশোধন করার চেষ্টা করো না। তোমার মা যেভাবে তার মেয়েকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার পরিণতি ভিনিই কেস করবে। আমার এতদিনের শিক্ষা সৎস্কারকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই পরিবেশে থাকতে আমি পারব না। মা শর্কটার মানে বিনাশের্তে তার কাছে মাথা নেয়াবে বলে যারা মনে করে আমি তাদের দলে নই। মায়ের গায়ে নোরা লেঙ্গ থাকলে তাঁকে মুন করিয়ে তবে জড়িয়ে ধরতে পারি।'

পরপর কয়েকদিন ধরে একই কথাবার্তা ঘুরেফিরে হচ্ছিল। দীপ্ত এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না। তার আত্মীয়স্বজন ধারাপ কথা বলবে এবং নিজের কাছেও ছোট হয়ে যাবে বলেই যাবে না। সে যাবে না এবং মোহরকেও যেতে দেবে না। বাধা পাওয়ার আগে একরকম ছিল, বাধা পেয়ে মোহর মরিয়া হয়ে উঠল। অফিসের একটা গেস্ট হাউস আছে সন্টলেকে। সেখানে কিছুদিন থাকার অনুমতি মিল সে। কলকাতা শহরে মহিলাদের উদ্রভাবে থাকার ব্যবস্থা এত কম যে মেয়েদের বাধ্য হতে হয় অপমান সহ্য করে থাকে যেতে। কালাজে সেইং গেস্টের বিজ্ঞাপন দেখে সে হাজরা রোডে গিয়েছিল। একটা ঘরে তিনজন মেয়ে রয়েছে, তাকে চতুর্থজন হতে হবে। পাখা একটাই, বাথরুমও একটা। সকালে চা এবং ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাবার দেবে না, রাতে ডিনার। কোনও গেস্ট আনা চলবে না এবং রাত সাড়ে নটার মধ্যে গেস্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এর বদলে তাকে আঠারোশো টাকা দিতে হবে। মোহর একা থাকাই ভাল মনে করায় গেস্ট হাউসে মাস তিনেক থাকবে বলে ঠিক করল। এর মধ্যে একটা স্ল্যাটের ব্যবস্থা করতেই হবে।

তিরিশ তারিখে মোহর দীপ্তকে বলল, 'আমি কাল সকালে চলে যাব।'

'তুমি ভুল করছ?'

'সেটা সময় বলবে। আমি তোমার জন্য তিনমাস অপেক্ষা করব। যদি আসতে পার তাহলে খুশি হব।' মোহর শান্ত গলায় বলল।

'যদি না পারি—?'

'তিনমাস পরে চিন্তা করে তোমাকে জানাব।'

'মোহর, তুমি এত অ্যাডামেন্ট! একটুও অ্যাডজাস্ট করতে পারো না?'

'সবাই তো সব কিছু পারে না। এ বাড়িতে আমার অনেক অসুবিধে হত। খাওয়া থাকা ব্যবহার—কই এ নিয়ে তো তোমাকে কখনও বিরত করিনি। আজ এতগুলো মাসেও তুমি বাথরুমটা সারাতে পারলে না কারণ তোমার মা ওতেই অভ্যস্ত।'

'কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে যাবে শেষপক্ষ। আমাকে তুমি চাও না?'

'চাই। চাই বলেই সঙ্গে যেতে বলেছি। চাই বলেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু আমার চাওয়া যদি তোমার কাছে সম্মান না পায় তাহলে পাশেই হয়ে থাকতে আমি কোনমতেই রাজি নই।'

পরদিন ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দীপ্ত। একটু বেলা হলে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল মোহর। সুটকেশ দুটো ট্যাক্সিতে তুলে সে ফিরে এল ভেতরে। দীপ্তর মা রান্না করছিলেন। মোহর বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

ভদ্দাফিলা উত্তর দিলেন না। একটু অপেক্ষা করে মোহর ট্যাক্সিতে উঠে বসল। আসনে শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল, 'চলুন।'

সেই রাতে গেস্ট হাউসের সুন্দর ঘরে একলা মোহরের মনে হয়েছিল পৃথিবীর মানুষের মন থেকে আবেগ জাতীয় অনুভূতি দ্রুত কমে যাচ্ছে। নইলে আজ তারা যে যার নিজের মত করে কষ্ট পেত। চলে আসার মুহূর্তে তার যে খারাপ লাগা ছিল এখন সেটা ভেমন করে নেই। যা নিয়েছে যা হয়েছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হচ্ছে করছে না। উল্টে এমন ভাবনাও আসছে, দীপ্ত এটাই চাইছিল। তার চালচলন, জীবনযাত্রা, ব্যাতি এবং চাকরি একে অবশ্যই বিভ্রান্ত করছিল। বিয়ের আগে যুগ থেকে যেটা আকর্ষণ করেছিল একসঙ্গে থাকতে গিয়ে সেটা অসহ্য হয়ে যেতে পারে। ওর মা এবং বোনের ব্যবহার চোখে দেখেও দীপ্ত চূপ করে থেকেছে, তাকে মানিয়ে নিতে বলেছে। সে যে একটু একটু করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে তা জেনেও প্রতিবাদের চেষ্টা করেনি। মাঝেমাঝে শরীরের অসুস্থতা হাড়া মোহরকে ওর প্রয়োজন ছিল না। শরীর, হ্যাঁ, তাকে শুইসর সময়ে শরীরের প্রশ্রসোয় ভরিয়ে দিত দীপ্ত। কিন্তু সে চলে আসবে জানা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে না যাওয়ার জন্যে মিনমিনে অনুরোধ করা ছাড়া একটুও জোর করেনি। মোহরের মনে হল এই ভাল হয়েছে। সে নিজেও তো দীপ্ত সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আই নিড ইউ দীপ্ত কথাটা কি আর তেমন করে উচ্চারণ করতে পারবে এখন?

দুদিন বাদে দীপ্ত কোন করল, 'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'আমি এটা চাইনি মোহর।'

'আমিও না।'

'তাহলে?'

'মাঝে মাঝে কোন করবে। আর যদি—', থেমে গেল মোহর। দীপ্তকে আসতে বলতে কোথায় যেন কুঠা লাগল এখন। নির্লজ্জ মনে হবে নিজেকে!

'রাখছি।' লাইনটা কেটে গেল দীপ্ত। খুব বিরক্ত হল মোহর। আর যদি বলতে কি বলার ছিল তা জ্ঞাতেই চালল না লোকটা। জানলে অসন্তোষ হবে, এটা কি জানত?

এখন দিনরাত কাজ এবং ফাঁকে ফাঁকে স্ল্যাট খোঁজা। বাঙালির চরিত্র অনুযায়ী এখন মোহরবিরাগী মানসিকতা তেমন প্রখর নেই। সামনে নির্বাচন নেই বলে রাজনৈতিক দল তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। এইসময় তার প্রবন্ধ রচনা করছে, 'পঞ্চাশে আপনি কতখানি বন্ধা?'

আবার শুকন উঠল। মোহর লিখল আগে চল্লিশ বছর পার না হতেই মেয়েদের শাড়ির রং সাদার দিকে যেত। শাড়ি পরার ধরনের আর অসিটাত ভঙ্গি থাকত না। এখন সেটা হয় না। এখন আপনি পঁচিশের তরুণীর ভঙ্গিতেই শাড়ি পরেন তবে রং রাখেন মোলায়েম করে। কিন্তু মহাশয়, যেহেতু তেরো বছর বয়স থেকে একটির পর একটি সম্ভান ধারণ করতে আর বাধ্য নন তাই শরীরের ব্যাক্ষ ফুরিয়ে যায় না। অথচ নিজের মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে তথাকথিত মা মা ভাবটি ফুটিয়ে, তুলতে চেষ্টা করেন বাধ্য হয়ে। আপনার বাহাশ বছরের স্বামী কিন্তু কুহি চাওলা থেকে বিন্দুবিদ্যুৎকালের সামনে হেঁটে যাওয়া খুব শরীর শরীর চোখে দাবেন। বন্ধুদের সঙ্গে আগের মত খিঁচিখিঁচিও করেন। রাত দশটা এগারটায় মদ্যপান করে বাড়ি ফেরেন। তার জীবনব্যাপন একই রয়েছে। আপনার কি দায় পড়েছে সম্মানসিঁনী সাহায়ে? আপনার ছেলে বা মেয়ে একটি বুদ্ধি বুদ্ধি মা, যা বাক্সা সিনেমায় এখনও চলে আসছে দেখতে চায় নাকি বন্ধুর মত আপনাকে পেতে আগ্রহী এটা কখনও ভেবেছেন? পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া প্রচুর পুরুষ বিয়ে অথবা প্রেম করছেন, এদের খবর কাগজে পড়ে টেট বৈকিয়ে বুড়ো বয়সে ভীমরতি বলায় দিন যে শেষ হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে তাই তার কাজকর্মগুলো আর এক ভায়ায় পড়ে থাকবে না। ধরা যাক, প্রেমট্রম অথবা বিয়ে আপনার ভাল লাগে না কিন্তু নিজেকে এভাবে না নিয়ে আর পাটাতা বাইরের কাজে নেমে পড়ুন না। যা ছিল একসময় পঞ্চাশে অবশ্যই তা এখন অন্তত সমস্তের গিয়ে ঠেকছে। আপনার মা কত বছর বয়সে কাঁদা নিয়ে দুবেলা জপ করতেন, আপনাকে দীক্ষার কথা ভাবতেই পারেন না। নিজেকে ভালোবার জন্য ধর্মচরণের মুখোশ পরার কোনও প্রয়োজন আপনার নেই।

লেখাটি অনেককেই বিরক্ত করল। বিরক্ত চিঠিপত্র ছাপা হতে লাগল। কিন্তু দিল্লির একটি কপাক্স তার প্রকাশিত লেখাটির অনুবাদ ছাপল। মোহর বুঝতে পারছিল তাকে বিতর্ক তুলতে হবে সবসময় নইলে লোকে ভুলে যেতে দেরি করবে না। তার সব লেখাই পত্রিকার সম্পাদকের ভাল লাগত না। উদ্দেশ্য যেখানে নগ্ন সেই লেখা লিখতে নিষেধ করতেন তিনি। তখন সাফল্যের নেশায় এত মশগুল এইসব উপদেশ পছন্দ করত না। এইসময় তার পরিচয় হল এক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। ডব্রলোক পঞ্চাশের গণ্ডিতে পৌঁছালেও আচার আচরণেও ফলক আছেন। খুব প্রভাবশালী সেই কাগজের বিশেষ প্রতিনিধির চাকরি পেতে অসুবিধে হুব না মোহরের। সম্পাদকের কন্যায়ে পার্ক স্ট্রিট পাড়ার একটি অতিচল ফ্ল্যাট আয়ত্তে এসে গেল। তার প্রথম লোকের নাম 'ভারতীয় সিনেমা এবং আবাস্ত্র মহিলারা।' মেয়েদের ছবিতে ব্যবহার করা হয় যে কম্পানায় তা শুধু যৌনমুখ মেটোনের জন্য—এই ছিল বিষয়। সেটা লিখতে যিয়ে মোহর কোনও আগল রাখল না। দ্বিতীয় ইংরেজি রচনার নাম, 'অল পারপাস মেইডসার্ভেট।' সম্পাদক রবিন মুরহেড সুদর্শন এবং তিনবার বিবাহবিচ্ছিন্ন। নারীর প্রতি আকর্ষণ তাকে সবসময় চকল রাখে। প্রায় প্রতিটি পাঠ্যেই তাকে মোহরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শহরে এ নিয়ে কথা বলার লোকের অভাব নেই। ইতিমধ্যে তারই উদ্যোগে একতরফা ডিভোর্স পেয়ে গেছে মোহর। রবিন যখন বিয়ের প্রস্তাব দিল তখন সে একটিই শর্ত দিয়েছিল, রবিনকে তার ফ্ল্যাটে এসে থাকতে হবে। রবিন আপত্তি করেনি।

ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখার হাত মোহরের ছিল না। সেগুলো অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হত। প্রতি সপ্তাহে একটি করে রচনা লেখা এবং তার আকর্ষণ বজায় রাখা যে বেশ কষ্টকর তা বুঝতে অসুবিধে হুব না মোহরের। কিন্তু সে হয় মানতে রাজি নয়। এই যে দীপ্তর সঙ্গে বিচ্ছেদ, সেটা অম্লদা মুখার্জি মানতে পারেননি বলে হৃদপদ্যের যাওয়া প্রায় ক্রিয়েরই নিষেধ ছিল। রবিনকে নিয়ে করা ব্রাহ্মণ পরিবার সহ্য করতে পারেনি। সে লিখল, 'পিতৃপুরুষের চাপানো ধর্ম মানতে আমি রাজি নই।' লেখাটি শেষ হয়েছিল এই বলে, বড়োমের তিরিশ বছর নারী তার যৌবন

উপভোগ করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের নিয়মকানুন অনুযায়ী সে ব্যাপারটাকে লজ্জাজনক ভেবে নিজেই বঞ্চিত করতে ভালবাসে। এইটো তার মা দ্বিদিমার কাছে সে শিখেছে। আমার প্রথম স্বামী জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। ডব্রলোক লুকিয়ে চুরিয়ে সোনাগাছি পাড়ায় গেলেও বাড়িতে আমার সঙ্গে একত্রিত হবার সময় মুন্সের ভাব এমন করতেন যেন মনে হত পাপকর্ম করছেন এবং আনন্দিত হবার সময় আমার কথা চিন্তাও করতেন না। সারা জীবন আমাকে ওই চাপ বহন করতে হত যদি বিবাহ বিচ্ছেদের পর আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করতাম। আমার দ্বিতীয় স্বামী জন্মসূত্রে খ্রিস্টান এবং আমার কথা বেয়ালে রাখেন। মনে রাখতে হবে এরা দুজনেই পূর্ববপুরুষের সূত্রে পাওয়া ধর্মের কোনও নিয়মকানুন পালন করেন না।

পরের রচনা 'পুরুষদের পক্ষে সেকুলার হওয়া সম্ভব নয়।'

যেহেতু ইংরেজি কাগজ তাই সারা দেশে মোহরের নাম ছড়িয়ে পড়ল। এবং দুর্নিমিত্ত। দেশের বিভিন্ন আলাপে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল। মামলাগুলোর মূল বিষয় একটাই। সে অযথা এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামাজিক বুনয়াদকে ভেঙে ফেলতে উৎসাহিত করছে। তার লেখাগুলোয় প্রকাশ্যে অশ্লীল উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা রয়েছে। তার দ্বিতীয় ইংরেজি বই, 'উত্তম্যান ইজ নট এ ফোর লেটার ওয়ার্ড' বিদেশেও পৌঁছে গেল।

এখন মোহরকে প্রায়ই বোম্বেয় দিল্লি করতে হয়। বি বি সিতে তার ইন্টারভিউ এবং বই পড়ে লন্ডনের একজন নারী সম্পাদক সরাসরি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখানে যাওয়ার জন্যে। এবং তখন থেকেই রবিনের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু। চতুর্থ শ্রীর উক্ত আশা যে ওই পর্যায়ে যাবে তা ডব্রলোক ভাবতে পারেনি। মোহরের শরীর তাকে তপ্ত রাখত কিন্তু মোহর যখন শহরের বাইরে যেত তখন অন্য নারীর সঙ্গ তার খারাপ লাগত না। কথাতা মোহরের কানে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। লন্ডন থেকে ফিরে এসে সে রবিনের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিল। কথা হচ্ছিল পত্রিকার অফিসে রবিনের চম্পারো বসে। রবিন অবাক হল, 'এটা কি?'

'বুঝতেই পারি।'

'চাকরি ছেড়ে দিতে চাও? অন্য কোথাও জয়েন করবে?'

'হ্যাঁ। লন্ডনে আমি একটা ভাল অফার পেয়েছি।'

'মাই গড! তুমি ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে?'

'যেতে হচ্ছে। শুধু বাকালি অথবা ভারতীয় মেয়েদের জন্যে না লিখে পৃথিবীর মেয়েদের জন্যে লেখা কি অনেক বেশি কাম্য নয়? মোহর হাসল।

'ওয়েল, তুমি যদি ইন্ডিয়া ছেড়ে যাও তাহলে আমাদের সম্পর্ক কি হবে?'

'আমরা বন্ধু হয়ে সারা জীবন থাকতে পারি।'

'দুজন দুই মহাদেশে থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে?'

'নাই বা থাকল।'

'তুমি ডিভোর্স চাও?'

'আই ডেন্ট মাইন্ড।'

'তোমার সম্পর্কে অভিযোগ ছিল নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া তুমি কিছু বোঝো না। এখন যেখাটি অভিযোগটা নিয়ে নয়।'

'না। কিন্তু আমি চলে গেলে তুমিও তো বেঁচে যাবে।'

'কি বলতে চাও?'

'আমি না থাকলে তোমাকে সঙ্গ দেবার মত নারীর অভাব নেই। এখন আমাদের সম্পর্ক আর প্রয়োজন নেই। আমরা যা পাওয়ার পেয়ে গেছি।'

রবিনের মুখ দেখে মনে হল তার এই মুহুর্তে খারাপ লাগছে। সে বলল, 'একটা অনুরোধ করল। তুমি ইন্ডিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে যেন কেউ জনতে না পারে আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। ব্যাস, এইকুই।'

পরের দিন সকালে গাড়ি নিয়ে হলদুপুরে চলে এল মোহর। সারাতা পথ একটা গাড়িতে বসে অনেকের মুখ মনে করছিল সে। লন্ডনে চলে যাওয়ার আগে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়। রবিনকে বিয়ে করার পর হলদুপুরে আসা হয়নি। অন্নদা মুখার্জী পছন্দ করেননি বলেই আসেনি। আজ কি করবেন তিনিই জানেন। এবার শাড়ি পরে এসেছে মোহর। শাড়ি পরলে তুলের অভাবটা বড় মনে আসে।

অন্নদা মুখার্জী এখনও স্কুলে আছেন। দিনটা রবিবার। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে মোহরের মনে হল কোনও কিছুই বদল হয়নি। বায়লদায় উঠে খোলা দরজা দিয়ে বাবাকে দেখতে পেল। খবরের কাগজ পড়ছেন, 'তুই?'

'এলাম।' সোজা চেয়ারে বসল মোহর।
সে লক্ষ্য করেছিল অন্নদা মুখার্জীর মুখে যে শুষ্কতা এসেছিল তা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। এখন যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন অলোক, 'কি ব্যাপার?'

'দেখা করতে এলাম। আমি লন্ডনে চলে যাচ্ছি।'
'চলে যাচ্ছিস মানে?'

'ওখানে চাকরি পেয়েছি। অনেকদিন হয়তো আসা হবে না। মা কোথায়?'
প্রশ্ন করামাত্র যাকে দেখতে পেল মোহর। শক্ত মুখে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন। সে উঠে মায়ের সামনে গেল, 'তোমাকে সারা জীবন জ্বালালাম, কি কপাল।'

মা কোনও জবাব দিল না। অন্নদা মুখার্জী বললেন, 'তোকে একটা প্রশ্ন করব মোহর। তুই যা লিখিস তা মন থেকে বিশ্বাস করিস না, না?'

'অবশ্যই করি।'
'না করিস না। সব মিথ্যে কথা। ভান। নইলে নিজের মাকে সুখী করতে চাইতিস।'

'আমি উত্তর দেব না। দিলে তোমাদের খারাপ লাগবে।'
'কোনও উত্তর তুই দিতে পারবি না। বললে বানানো কথা বলবি। দীপ্তকে তুই বিয়ে করবি,

আমরা বাধা দিইনি। অথচ বারবারের লেখা সত্ত্বেও তাকে এখানে নিয়ে এলি না। উল্টে তাদের বিয়ে ভেঙে গেল। শুনতে পাই তার ব্যবহার তার মা-বোন মেনে নিতে পারেনি। অথচ তুই মেয়েদের জন্যে লিখিস। তারপর একজন খ্রিস্টানকে বিয়ে করলি—'

'ভ্রমলাকের একমাত্র অপরাধ তিনি খ্রিস্টান, তাই তো?'

'না। সেটা কখনও অপরাধ হতে পারে না। শেকসপিয়ারকে আমি সারাজীবন মাখায় করে রাখব। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমি আমার সংস্কার মেনে চলব। তুই বিয়ে করার আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলি না। এখন এসেছি লন্ডনে চলে যাওয়ার খবর দিতে। চিরিতই জানাতে পারতিস।'

হঠাৎ মা বললেন, 'এখন আফসোস করছ কেন?'

অন্নদা মুখার্জী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মা বললেন, 'ওর দশ বছর বয়স থেকে আমি যখন বলতে শুরু করেছিলাম মেয়েকে প্রণয় দিয়ো না তখন কানে তোলেনি। তুমিই ওকে আশঙ্কায় দিয়ে মাখায় তুলেছ। পাঁচজনের আপত্তি গ্রাহ্য করেনি। অতখানি স্বাধীনতা দিলে পরিণতি এই হবেই। এখন আফসোস করে কোনও লাভ নেই। ও যদি দ্বিধীবাদের বিয়ে করে ভাল থাকে থাকুক। আমাদের কিছু বলার নেই।'

'তার স্বামীও লন্ডনে যাচ্ছে?'

'না। ওকে এখানে কাগজ চালাতে হবে।'

'দুজনে দুদেশে থাকলে সম্পর্ক থাকবে?'

সম্ভবত থাকবে না।

'সে কি রে।'

'বাস্তবকে মেনে নিতে হবে বাবা।'

হঠাৎ গলার স্বর পাশটো ফেললেন অন্নদা মুখার্জী, তুমি কি আজই ফিরে যাবে?'

'এখন মনে হচ্ছে আমি থাকলে তোমাদের অস্বস্তি বাড়বে।'

'আমাদের স্বস্তি নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। একটা রাত থেকে যাব।'

যে বাড়িতে শৈশব কৈশোর কেটেছে, যার প্রতিটি কোণে কত স্মৃতি ছড়ানো সেই বাড়িতে একটা রাত থাকার সময় নিজেকে বিদেশি মনে হওয়া যে স্বাভাবিক হতে পারে তা কখনও ধারণায় ছিল না মোহরের। মা চুপচাপ আছেন, মেয়ে যে নীত হয়ে গেছে সে ব্যাপারে যেন কোনও সন্দেহ নেই। স্কুলে ফুটবল ম্যাচ থাকলে মা ঠিক এই রকম ব্যবহার তার সঙ্গে করতেন। মানুষের বয়স বেড়ে গেলেও কোনও কোনও আচরণের বদল হয় না।

বাবা গভীর। অবশ্য ডাইভারের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অনেক অনেক দিন বাসে খাওয়ার ট্রেবলে একসঙ্গে খেতে বসেছিল ওরা। আচমকা চেনা রান্নার স্বাদ, গন্ধ, দারুণ পুলকিত করেছিল মোহরকে। সে অঙ্ককার ঘরে বসে ওই রান্না খেলে বলে দিতে পারবে মা ঠেংছে। এইভাবে অতীতের কাছে চলে যাওয়া যায়। এইসময় সেতু কেউ কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু মানুষের সম্পর্কে যদি জং ধরে তাহলে তার মেরামতির কায়দা তার জন্যে নেই।

রোদ পড়লে মোহর অন্নদা মুখার্জীকে বলল, 'একটু ঘুরে আসি।'
অন্নদা মুখার্জী বাইরের ঘরে বসে বই পড়ছিলেন, মাথা নাড়লেন নিশ্চন্দে।

গাড়ি নিল না মোহর। রাস্তায় পা দিয়ে আগের মত স্বাভাবিক ছন্দে হাঁটতে দিয়ে সে লক্ষ্য করল সবাই তাকে দেখছে। ভাক শুনে জ্বালায় এসে সবিশেষ তাকে চাচ্ছে অনেক। হলদুপুরের মেয়ের এমন অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না। সে সালোয়ার কামিজ পরেছিল আজ। এই পোশাকে তাকে ফন্দ লাগে না।

ক্রমশ মানুষের বিস্মিতি দৃষ্টিতে সে উপেক্ষা করতে শিখে গেল। সোজা চলে এল ধ্যানদার কাছে। বাড়ির লাগোয়া আশ্চর্য্যে তখন জুতো চর্চা চলছে। এতগুলো বছরে একটুও বদলায়নি জায়গাটা। ধ্যানদা একজনকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বুক সাশা হয়েছে, শরীর রোগা। তাকে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হলেন এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন, 'তুই? কবে এলি?'

'আজ।' হঠাৎ কি হচ্ছে হল ঝুঁকে প্রশ্নাম করল মোহর।

'তার এইসব দোষ তো আগে ছিল না।' ধ্যানদা হাসলেন।

'কেমন আছেন?'

'ভাল। এখন ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। ওই যে ছেলেটা, ওর নাম মালিক, এবার অলবেঙ্গল রানার্স হয়েছে। তাকে নিয়ে প্রথমবার গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

মোহর চুপচাপ মাথা নাড়ল। হঠাৎ তার কই হচ্ছিল। কেন হচ্ছিল সেটা সে জানে না।

'তুই তো এখন নামকরা লেখক। একটা দুটো লেখা পাড়েছি আমি।'

'আমি তো গল্প-উপন্যাস লিখতে পারি না।'

'কি দরকার? তুই যেটা পুস্তিক তাই লিখবি। মানুষের চোখ ফোটানো খুব দুরূহ ব্যাপার। কারণ, প্রকৃতি মানুষকে যে দাঁড়ান করে তার বাইরে সে সহজ যেতে চায় না।'

'ধ্যানদা, আমি যে জুতো ছেড়ে দিয়েছি আপনাকে কিছু না বলে তাতে আপনি রেগে যাননি?'

‘না। তুই যেটুকু শিখেছিলি সেটুকুই তোর দরকার ছিল। তুই যদি না ছাড়তিস তাহলে আজ বিখ্যাত হতে পারতিস না।’

‘ধ্যানদা, আপনি কি জানেন আমার প্রথম বিয়ে টেকেনি? আমি দ্বিতীয়বার যাকে বিয়ে করেছিলাম তার সঙ্গেও বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে।’

‘এগুলো তো আনন্দের খবর নয়। আবার লোকলজ্জার জন্যে যদি বিচ্ছিন্ন না হতিস তাহলে তোকেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। বাইরে থেকে আমি কি করে বুঝব তোর সমস্যা কি ছিল?’

‘আমি লন্ডনে চলে যাচ্ছি ধ্যানদা। ওখানে চাকরি পেয়েছি।’

‘শুভ! আমি তো একটা ভায়াগায় আটকে থাকলাম কিন্তু তাদের উন্নতির কথা শুনে ভাল লাগে। উপেনকে তোর মনে আছে? তোর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই উপেন এখন পুলিশ সার্জেন্ট। সেদিন এসে দেখা করে গেল। এখনও চেহারা ঠিক রেখেছে।’ ধ্যানদা হাসলেন।

‘প্রাণেশ কেমন আছে?’

‘প্রাণেশ? ও, গুর কথা বলিস না। ও নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘কি রকম?’

‘প্রথম প্রথম স্মাগলিং করত। প্রচুর টাকা অন্যায্যভাবে রোজগার করে উড়িয়েছে। মদ বেয়ে থাকত দিন রাত। অন্যসব দাশও ছিল। পুলিশ ওকে ধরে। তিন বছর জেল বাটে। এখন শরীর ভেঙে গেছে। খুব অর্ধাভাবে আছে শুনেছি।’

‘ও কোথায় আছে?’

‘দের পুরনো বাড়িতে। আত্মীয়স্বজন কেউ সঙ্গে থাকে না। এক বুড়ি পিসি এখনও আছে। তা গুর কথা এত জিজ্ঞাসা করছিস কেন?’

‘আমি গুর কথা লিখতে চাই। এক সময় আপনার ভাল ছাত্র ছিল, আজ কোথায়!’

‘লিখলে সত্যি কথা লিখিস। আমি নিজেও ওকে বুঝতে পারি না। সবাই যেম্মা করে অথচ আমি মুখে বললেও সেটা মনে আনতে পারি না।’

প্রাণেশের বাড়িতে কখনও যায়নি মোহর। ধ্যানদা একটা ছেলেকে সঙ্গে দিলেন। সে আর্থ মাইল হেটে প্রাণেশের বাড়ি চিনিয়ে দিল। বাইরে থেকেই বোঝা যায় বাড়ির মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা। পলন্তারায় খসে গেছে, কোথাও হিটও। ছেলেটিকে বিদায় করে মোহর দরজার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে সাড়া এল। দরজা খুলল যে সে যেন অনেকদিন বাে অবাক হল। তার চেয়ে কম হয়নি মোহর। রোগা লিক লিকে প্রাণেশের অতীতের ছায়াও নেই। চোয়াল বসে গেছে, উঠেছে মাথার চুলও।

‘প্রাণেশ? আমি মোহর।’

‘ও, হ্যাঁ। কি ব্যাপার?’

‘তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।’

‘কেন?’

‘তোর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে না?’

‘পাণ্ডারার আসে।’

‘আমাকে চিনতে পারছিস?’

‘হ্যাঁ। দশটা টাকা দিবি? অন্তত পাঁচ?’

‘কি করবি?’

‘বুড়িটাকে দেব চাল আনতে আর মাল খাব। প্রাণেশ হাসল, ‘পুরনো বন্ধু তুই, তাই সত্যি কথা বললাম। আজকাল আমার কোনও রোজগার নেই।’

‘তোর এই অবস্থা হল কি করে?’

জবাবে শুধু ঠোট ওস্তাল প্রাণেশ। সোজা হয়ে দাঁড়তে পারছিল না সে। মোহর ব্যাগ খুলল। অনেক বেশি টাকা সে দিতে পারে প্রাণেশকে কিন্তু তার খুব রাগ হচ্ছিল। হাইওয়ের পাশে নির্জনে যে প্রাণেশ তার পিঠে ছুরি ছুরি ঠেকিয়ে জামা খুলতে বাধ্য করেছিল এবং তারপর যে কখনও সামনে আসেনি সে ইলেকট্রিক স্মৃতিতে যেভাবে এতদিন বেঁচেছিল তা চুরমার করে দেবার জন্যে এই রক্তন মানুষটার ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। দশ টাকার নোট বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই চিকিৎসা করাস না?’

‘ফোঁচ! অসুখ সারবে না। আর সারলে কি লাভ। কোনও শালা আমাকে উয় পাবে না, মাল দেবে না। একটা ভাল মেয়েহলে যে আমি পাব না। আলাভাত খাওয়ার জন্যে প্রাণেশ বেঁচে থাকতে চায় না। সে।’

দশ টাকা দিয়ে চুপচাপ রাস্তায় নেমে পড়ল মোহর। এবং তখনই তার রক্তনার কথা মনে এল। রক্তনার বাবা প্রাণেশকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। যে কোনও বাবাই মেয়ের নিরাপত্তা দেখতে চায়। রক্তনা এখন কোথায়? ওদের বাড়িতে গেলে কেমন হয়?

এখন প্রায় সন্ধ্যা। রক্তনার বাবা এবং মা সেই আগের মত বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন। অল্পোকে বললেন, ‘আপনি?’

‘আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি মোহর, রক্তনার সঙ্গে পড়তাম।’

‘গুহো। এসো এসো। তুমি তো এখন খুব বিখ্যাত হয়েছো। ভারতমোজা নাম। কিন্তু তোমাকে দেখলে ভয় করবে, বাড়িতে আবার বিপ্লুরে বীজ না বুনে যাও।’ রক্তনার বাবা নিজেই হাসলেন। উপেক্ষা করল মোহর, ‘রক্তনার খবর কি?’

‘একটু আগে ডাক্তারের কাছে গেল। নন্দিনীকে চেনো। ওদের সঙ্গে পড়ত। সে তো এখন হলুদপুরে ডাক্তারি করছে। খুব ভাল প্র্যাকটিস। রক্তনা ওর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে দেখাতে।’

নন্দিনী যে হলুদপুরেই ডাক্তারি করছে তা জানত না মোহর। তার চেয়ে অবাক কাম রক্তনার মেয়ে হয়েছে। তার মানে বিয়েধা করে এখন সন্ন্যাসী সে।

‘বোসো না। স্বতীথানেকের মধ্যে এসে যাবে।’ বাবা বললেন, ‘তুমি তো ইংরেজি কাগজে আছ?’

‘হিলাম। লন্ডনে চলে যাচ্ছি।’

রক্তনার মা বললেন, ‘সেই ভাল। তুমি যা লেখ তা সাহেবদের ভাল লাগবে।’

কথা ব্যাড়াত বয়স কম থাকলে। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘নন্দিনীর চেম্বার কোথায়?’

‘কালীমন্দিরের পাশে।’

‘আমি এলাম।’ মোহর হাঁটতে শুরু করল।

নন্দিনীর চেম্বার বুকে পেতে অসুবিধে হল না। এর মধ্যে অনেক পেশেন্ট এসে গেছে। হলুদপুরের একমাত্র মহিলা ডাক্তার হিসেবে নন্দিনী যে জনপ্রিয় তা বোঝা যাচ্ছে। এত বছর পরেও বাচ্চা কোলে নিয়ে বসা রক্তনাকে চিনতে অসুবিধে হল না। রক্তনা মোটা এবং আরও ফর্সা হয়েছে। সুখী গৃহিণীর ছাপ সর্বত্র। অন্য মহিলাদের বিশ্মিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সে রক্তনার সামনে দাঁড়াল, ‘ভাল আছিস?’

রক্তনা অবাক হয়ে দেখল, ‘বাবো। চিনতেই পারিনি!’

‘কেন?’

‘তোকে এ পোশাকে কখনও দেখিনি। তুই তো এখন বিখ্যাত মানুষ।’ রক্তনা হাসল, ‘মোহর মুখারি সঙ্গে আলাপ আছে বলল কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কর্তা, খুব ভাল মানুষ, সে-ও বলে সত্যি তোমারা বন্ধু ছিলে।’

‘তুই কর্তা বলিস মুখি?’

‘যা মুখে আসে তাই বলি। এই যে এখন বাবার কাছে এসেছি তাতে ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রোজ ফেন। বিল তো আমাদেরই দিতে হবে।’

‘নন্দিনী ভেতরে আছে?’

‘হ্যাঁ। খুব ঢাকা কামাচ্ছে। বিয়েখা করেনি তো? হ্যাঁরে, তুই দুবার বিয়ে করেছিস?’

দুবার বিয়ে করা মহিলাকে দেখার জন্যে সবকটা চোখ এখন এদিকে। রঞ্জনার গলার স্ফর সবাই শুনতে পেয়েছে। মোহর হাসল, ‘হ্যাঁ?’ তুই আর কিছু বলবি?’

এই সময় নন্দিনী চেশ্বরের থেকে বেরিয়ে এল। চেহারা একই রকম রয়েছে। তবে ব্যক্তিত্ব এসেছে মুখে। হেসে বলল, ‘কি খবর? আজ এসেছে? থাকছে তো? তাহলে রাতে চেশ্বরের সেরে তোমাদের বাড়ি যাব। তখন কথা বলা যাবে।’

‘বেশ। চলি রঞ্জনা।’ বেরিয়ে এল মোহর। নন্দিনীর কথা বলার ধরন এবং সে যে এখন পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এটা বুঝিয়ে দেওয়া খুব ভাল লাগল মোহরের। এ সময় নন্দিনী যদি পেশেন্টদের ফেলে রেখে তার সঙ্গে গল্প জড়তে তাহলে নিকচুই অন্যায়া করত।

রাত দশটার কিছু আগে নন্দিনী এল। তাকে দেখে বাবা এবং মা যে খুব খুশি তা বুঝতে পারাছিল মোহর। ওদের সঙ্গে কথা শেষ করে নন্দিনী স্কিঞ্জাস করল, ‘এবার বসো, কি খবর?’

মা উঠে চলে গেলেন ভেতরে, বাবাও।

মোহর হাসল, ‘ভালই। তুমি তো এখানে চমৎকার প্রাকটিশ করছ।’

‘ঘরের মেয়ে বলেই—’

‘বিয়ে করবে না?’

‘আমার যা চেহারা তাতে কোনও ছেলের বাবা-মা পছন্দ করবে না। কোনও ছেলে এগিয়ে এসে প্রেম নিবেদন করেনি বলে সেটা করা হয়নি। অনেকের তো অনেক কিছু হয় না। নন্দিনী হাসল, ‘তোমাকে আমি লেখালেখি করতে বলেছিলাম একসময়, মনে আরহ?’

‘আছে। আমার লেখা তুমি পড়?’

‘প্রথম প্রথম পড়তাম। তোমাকেও চিঠি দিয়েছিলাম। এখন পড়ি না।’

‘কেন?’

‘পছন্দ হয় না। মনে হয় তুমি প্রচার চাইছ। বাস্তবকে উপেক্ষা করে লিখছ। যাঁরা তোমার পাঠক তারা তোমাকে আর পছন্দ করছে না। যাদের জন্যে কলম ধরেছিল তারা তোমাকে সহ্য করছে না। কেউ একথা তোমাকে বলে কিনা আমি জানি না। কলকাতার কিছু বিখ্যাত চিত্রপটিলক আছেন, যাদের ব্যক্তি ফিশন ফেক্টিভালগুলোতে অথচ বাম্বা ভায়ায় ছবি করলেও তাঁদের ছবি বাঙালি দেখতে চায় না বলে হলে রিলিজ করে না। তুমি সেই পর্যায়ে চলে গিয়েছ।’

‘আমি যা লিখছি তা কি মিথ্যা?’

‘না। তুমি কম্পিত সত্যকে হাতিয়ার করলে। মানুষের যেকোনও আচরণের অনেকগুলো শেড থাকে। তুমি একটাকে তুলে ধরে অন্যগুলোকে অস্বীকার করছ। তোমার নায়িকা ফুলশয্যার রাতে দরজা খুলে স্বামীর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে কিন্তু সেটাই এদেশের একমাত্র করণীয় নয়। ভারতবর্ষের অনেক শ্রেণীর মানুষ মনে করে ফুলশয্যার রাতে স্বামী যদি স্ত্রীকে না ব্যবহার করে তাহলে বিবাহ সুখেই হয় না। সেসবক ক্ষেত্রে স্ত্রী হতাশায় কেঁদে ভাসায়। তার কথা তার মত করে তোমার কলমে তো কখনও লেখা হয়নি?’

‘তুমি ওটা সমর্থন কর?’

‘আমার সমর্থন নিয়ে তাদের কিছু যায় আসে না। মালদার একটি গ্রামের মানুষকে দিয়ে তুমি বাগবাছারের ভাষা হাজার চেষ্টা করে কয়েকবার বলতে পার কিন্তু গ্রামে ফিরে নিজের মানুষদের সঙ্গে সে নিজের ভাষায় কথা বলবেই। এটাই স্বাভাবিক। তুমি ভুল বলে কেউ মানবে কেন?’

‘চমৎকার। এই ভাবে তোমরা একটা অন্যায়াকে প্রশংসা দিয়ে যাচ্ছ।’

‘ন্যায়া অন্যায়া ব্যাপারটা কোন নিরিখে মাপবে। যা সত্যিকারের অন্যায়া তা আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেই আমি ডাক্তারি করছি কিন্তু যে কোনও বাইরের কাজ পায়নি সে যদি সংসারের কাজগুলো করে তাকে তুমি ব্যঙ্গ করতে পার না। নন্দিনী হাসল, ‘ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে কাগড়া করব। করে ফেললাম। তুমি এখন প্রচুর নাম করছে। সেইসঙ্গে টাকাও। তোমার উদ্দেশ্য সফল?’

‘মানে বুঝলাম না।’

‘সেনি একটা কাজে পড়ছিলাম ফেক্টিভাল ফিশনের পরিচালকরা ভারতবর্ষের গরিব নিম্নশ মানুষদের গল্প ছবি করতে পছন্দ করে কারণ সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে খুব চলে। দারিদ্র্য খুব ভাল এরপোর্ট আইটেম। আমাদের দেশে এখন মেয়েদের হয়ে ডেসপার্টে কথা বললে বই ভাল চলে, আগে সহানুভূতির সঙ্গে বললে চলত। যাক, কদিন আছে?’

‘কাল চলে যাবে। মোহরের আর ভাল লাগছিল না।’

‘মোহরশাই মাসিয়ার কথা একটু বোয়ালে রেখো। খুব ডিপ্রেসনে ভুগছেন ওঁরা। চলি।’

নন্দিনী চলে গেল। মোহরের মনে হল বিয়েখা না করলে মেয়েদের মন একপেশে হয়ে যায়। কারও ভাল সহজমানে নিতে পারে না।

রাহের খাওয়া চুক গেলে গুয়ে পড়েছিল মোহর। ঘরের আলো নেভানো ছিল। শুয়েছিল কিন্তু ঘুম আসছিল না। নন্দিনী অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে কিন্তু ওর বলার সহজ ভঙ্গিটা এখন মন জ্বালাচ্ছে। না, আমি ঠিক করছি। যা ভেবেছি তাই লিখেছি। দীপ্তর পরিবার মনে নিয়ে ওর সম্ভানকে পৃথিবীতে এনে যাই ওখানেই থাকে যেতাম তাহলে মানুষ হিসেবে আমার কোনও সম্ভাল থাকত না। এইভাবেই যে বাংলার লক্ষ লক্ষ মেয়ে মরে বেঁচে আছে তা নন্দিনীদের বোকানো মনে পড়ে না। রবিনকে আমি ব্যবহার করিনি। ওকে আমার ভাল লগেছিল। বরং বলা যেতে পারে ওই আমাকে ব্যবহার করেছে। আমি শহরে না থাকলে ও অন্য মেয়েদের সম্ভান করেছে। তাই ওকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। এই রবিনের সম্ভান যদি পৃথিবীতে আসত তাহলে জীবন জটিল হয়ে যেত। অতঃপর আমি ভুল করিনি।

হঠাৎ পরজায় শগ হল। অমদা মুখার্জির গলা অক্ষপায়ে বাজল, ‘দুমিয়ে পড়েছিস?’

‘না। কিছু বলবে?’ মোহর উঠল না।

‘তার জন্যে খুব চিন্তা হয় মা?’

‘কেন? আমি তো কোনও অন্যায়া করিনি বাবা।’

‘জানি না। কিন্তু এত অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে কোনও কিছুই সঙ্গে তুই মানাতে পারবি না। তোরও তো বয়স বাড়ছে। তুই যা লিখিস তা কি সত্যিই বিশ্বাস করিস?’

‘হ্যাঁ বাবা, করি।’

‘হুম।’ অমদা মুখার্জি দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। মোহর উঠল। কাছে এসে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে, ‘বাবা, আমার জন্যে তুমি এত চিন্তা কোরো না।’

অমদা মুখার্জি কোনও কথা বললেন না।

এখন গুছিয়ে নেবার সময়। কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলে অনেকগুলো কাজ শেষ করতে হবে। প্রকাশকদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থায় আসতে হবে। নিজের যেসব জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না সেগুলো কোনও অন্য আশ্রয়ে আসতে হবে। মোহর খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন রবিন এই ফ্ল্যাটে ক্যাচিং আছে। এলে দু-একটা কথা বলে ফিরে যায় নিজের বাড়িতে। ডিভোর্সের জন্যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুজনই সম্মত বলে সেটা পেতে অসুবিধে হবে না বলে মোহরের উকিল জানিয়েছেন। ইদানীং রবিন খুব অনুভূত ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে।

কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিল প্রকাশকের কাছে। সে ভারতবর্ষে না থাকলে টাকা কোন অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে সেই ব্যবস্থা করে বেরিয়েছিল এই সময় স্টুডেন্টস হলের দরজায় ফেঁদুনিটা চোখে পড়ল। কোনও একটি লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোগে কবিসম্মেলন হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন দীপ্তর সঙ্গে এককম সম্মেলনে টাইটী করে খুরে বেরিয়েছে সে। এখন—!

মোহর গেটে দাঁড়াতেই মাইকে দীপ্তর গলা শুনতে পেল। ডায়ালোজ দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ছে। আর একটু এগিয়ে মনে হল বেশ রোমাংস হয়ে গেছে দীপ্ত। ওর চোখ বন্ধ করে কবিতা বলা, পাঞ্জাবির আন্তিন গোটানো, কপালে পরে থাকা রুখু চুল আচমকা নাড়িয়ে দিল মোহরকে। তার এই বয়স পর্যন্ত যে জীবন সেই জীবন দীপ্তই ছিল একমাত্র পুরুষ যে চাইলে একসময় পৃথিবীটা দিয়ে দিতে পারত। প্রাণেশ আচমকা তার দরজা খুলে দিল, কিন্তু ওই পর্যন্ত। রবিনের হাত ধরে সে বাহারি পোশাকে সেজে বেরিয়েছে কিন্তু দীপ্ত তাকে আটপৌরের আরাম দিয়েছিল শোওয়ার ঘরে। সেইসব মুহূর্তগুলো কি সুখের ছিল। কবিতা পড়ে ডায়াল থেকে নামতে কিছু হাততালি পড়ল। আর একজন কবি উঠে যেতে দীপ্ত এগিয়ে যাচ্ছিল চেয়ারের দিকে। মোহর দ্রুত তার কাছে পৌছে গেল, 'কেমন আছ দীপ্ত?'

দীপ্ত অবাক। কিন্তু তার মুখে কৃত্রিম ছাপ দেখতে পেল মোহর। দীপ্ত বলল, 'আছি!'

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আসবে?'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানে।'

'ঠিক আছে। ভেবে দেখব।'

'না কোনও ভাবনা নয়। এখনই চলে।'

'এখন কি করে যাব? অনুষ্ঠান চলছে।'

'এখন অনুষ্ঠান আরও হবে কিন্তু তখন আমি এদেশে থাকব না।'

দীপ্ত অসহায় ভঙ্গিতে তার বন্ধুর দিকে তাকাল। তারাও এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। মোহরের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাঘাত তাদের জানা। ওদের চোখে অপছন্দ শব্দটাকে ধরতে পারল মোহর। পড়ে মরিয়া হল, 'চলো, পিছু। আমি তোমাকে আর কখনও অনুবাহ্য করব না।'

যিনি কবিতা পড়তে উঠেছিলেন তিনি ডায়াল চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ছোট্ট হলঘরে কেউ কথা বললে যে অসুবিধা হয় তা তাঁর ভঙ্গিতে স্পষ্ট। দর্শকদের একজন বলে উঠল, 'বাইরে গিয়ে কথা বলুন না।'

দীপ্ত তার বন্ধুরে বলল, 'আসছি।'

'কতক্ষণ?'

'এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।'

মোহর দীপ্তকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তার স্বাস্থ্য এবং ঔজ্জ্বল্যের পাশাপাশি দীপ্তকে অনেক রূপগ এবং নিশ্চয় দেখাচ্ছে। গাড়ির দরজা খুলে মোহর বলল, 'ওঠো।'

'কোথায় যাব?'

'আজ আমি যা বলব তাই তুমি শুনবে।'

'আমি কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

'দেখা যাবে।'

পাশাপাশি বসে ইচ্ছেসঙ্গে কথা বলল না মোহর। ড্রাইভার তার যে চেহারা জানে তা পাশটাকে চাইল না সে। একসময় দীপ্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমার ফ্ল্যাটে।'

ফ্ল্যাটে ঢুকে দীপ্ত বলল, 'ভালই আছ। নিজের ফ্ল্যাট?'

'না। আগের অফিস থেকে পেয়েছিলাম।'

'আগের অফিস মানে?'

'আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। বিদেশের একটা কাগজে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা! হিংস্রভাবে লিখবে?'

'প্রথম প্রথম একজন অনুবাদ করে দিত। লেগে থাকলে সব কিছু হয়। এখন নিজেই লিখি। এসব কথা থাক। কি খাবে বলে। হুইশ্বিক?'

'তোমার ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই?'

'না। সকালে একজন আসে ক্রিন করতে, ব্যাস।'

'তোমার বর্তমান স্বামী?'

'আমরা আলাদা থাকি। মোহর বিরক্ত হচ্ছিল, 'ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলো এখানেই শেষ হোক।'

সোফায় বসে দীপ্ত বলল, 'আমি আজকাল মদ খাচ্ছি না।'

'মাই গড? কেন? চোখ বড় করল মোহর।'

'পেটে ব্যথা হয়।'

'লিভার?'

মাথা নাড়ল দীপ্ত, হ্যাঁ। মোহর ওর চেহারাটা আবার দেখল, 'ওষুধ খাচ্ছে?'

'ওই আর কি?'

'চাকরিটা আছে তো?'

'গেলে খাব কি? বাড়িতে আর একজন তো রয়েছে।'

'একজন কেন?'

'বোন তার বিয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আবার ব্যক্তিগত কথা এসে যাচ্ছে। জল খাব।'

মোহর এক গ্লাস জল এনে দিল। দীপ্ত গ্লাস ফেরত দিতে বলল, 'তুমি ওঠ। একটু রেস্ট নিয়ে চল।'

'ঠিক আছি।'

'একদম ঠিক নেই।'

শোওয়ার ঘরে নিয়ে এসে পাশের দরজাটা খুলে দিল মোহর, 'ভেতরে যাও? স্নান করে ফেল। আমি পাঞ্জামা দিচ্ছি। তাই পরে একটু শুয়ে থাকো। আমি খাবার বানাই।'

'তুমি খাবার বানাবে?'

'আমার মত করে। যাও, কথা বাড়িয়ে না।' জায় জোর করে দীপ্তকে বাধারূপে ঢুকিয়ে দিয়ে সে ওয়ার্ডরোব থেকে একটা পাঞ্জামা বের করল। তার নিজের পাঞ্জামা, কিন্তু দীপ্তর হয়ে যাবে। দরজায় নক করে বলল, 'পাঞ্জামাটা বাইরে হইল।' তারপর স্ট্রিটগেট সুমনের রবীন্দ্রসমীতির ক্যান্ডেল চালিয়ে দিয়ে কিতেনে চলে এল। বারোশো স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাট সুমনের গলা অঙ্কুর আমেজ তৈরি করছে। টোপটার পিউরুটি চাপিয়ে কর্নফ্রেকস তৈরি করতে শুরু করল সে। এই সময়টা তার খুব ভাল লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল ঠিক এইরকম একটা জীবন সে চেয়েছিল। খুব অল্প চাওয়া অথচ অল্পটুকুই পাওয়া হল না। আচ্ছা, আজ যদি দীপ্ত ফিরে না যায়, আজ, কাল, এবং চিরটা কাল যদি এই ফ্ল্যাটে তার কাছে থাকে তাহলে? তাহলে সে কোথাও যাবে না, লন্ডনে তো নয়।

বাওয়ার টেবিলে বসে মোহর বলল, 'তোমার লিভারের জন্যে এই মেনু ভাল।'

কর্নফ্রেকসে চামচ দিয়ে দীপ্ত বলল, 'আমার খারাপ লাগছে না। প্রথম তোমার রান্না খাচ্ছি।'

'পাঞ্জাবিটা পরে আছ কেন?'

'লভার পেজি পরি না তা তুমি জ্বলে গেছ।'

‘খালি গায়ে থাকতে। কে দেখতে আসছে?’

‘চারধারে যে সাহেবি ব্যবস্থা, খালি গা মনাবে?’

‘খুব মনাবে। খোল, দাঁড়াও আমি খুলে দিচ্ছি।’

কিন্তু দীপ্ত নিজেই খুলল। সময়ে পাঞ্জাবিটাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে হ্যাঙ্কারে খুলিয়ে দিল মোহর। অনেককাল পরে নাকে সেই চেনা গন্ধ এল। ফিরে এল বাওয়ার টেবিলে। পেছন থেকে দীপ্তর পিঠি দেখে মনে হচ্ছিল বেচারার ওপর অনেক ধকল গেছে। সামনে বসে বৃকের পাঞ্জর দেখতে পেল। কিরকম মায়া ছড়িয়ে পড়ল মনে।

খাওয়া শেষ করে শোওয়ার ঘরে ঢুকে সে দীপ্তকে জড়িয়ে ধরল। দীপ্ত বলল, ‘এসব কেন?’

‘আমার ভাল লাগছে, তাই।’

‘তুমি অদ্ভুত।’

‘আমাকে তোমার খারাপ লাগছে?’

‘লাগলে কি এখানে আসতাম?’

‘তুমি তো মাত্র একঘণ্টার জন্যে এসেছিলে।’

আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে মোহর অপরক ভাকিয়েছিল। দীপ্ত এখন শিশুর মত ঘুমাচ্ছে তার বিছানায়। ওর মুখে যতই ক্লান্তির ছাপ থাক এখন এই মুহূর্তে ত্বিরির আলো মাখামাখি। মোহর নিজে কি ভুগু? এত অস্পষ্ট, এত সহজকি কি মানুষ ভুগু হয়? এইভাবে গোটা জীবন যদি কাটিয়ে দেওয়া যেত। দীপ্তর মধ্যে যে তেজ ছিল সেটাকে যদি আবার জাগিয়ে দেওয়া যেত। মোহর জানে সঙ্গে থাকলে সে পারবেই। এই সময় বেগে বাজল।

শব্দটা সমস্ত ফ্ল্যাট কাঁপানো। দ্বিতীয়বার বাজলে হয়তো দীপ্তর ঘুম ভেঙে যাবে। তাড়াহুড়ি নিজেই জড়িয়ে খাট থেকে নেমে দরজায় চলে এল মোহর। চেনটা লাগিয়ে সব ঝোরাল কে। দরজার ওপাশে এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে রবিনকে টিনতে অসুবিধে হল না।

রবিন বলল, ‘খোল।’

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয়ে গেল মোহর, ‘ঘরে লোক আছে।’

‘মানে?’ উকি মেরে দেখতে চাইল রবিন। সেই সময় দীপ্ত খালি গায়ে উঠে এসেছে। তাকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত রবিন মোহরের দিকে তাকাতাই মোহর বলল, ‘আমার প্রথম স্বামী।’

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা অদৃশ্য হল। জুতোর শব্দ দ্রুত নেমে যেতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা বন্ধ করে দিলো মোহর। দিয়ে বলল, ‘রবিন।’

‘তোমার স্বামী?’

‘ছিলো। আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি।’

‘সে কি?’

‘মেলাতে পারলাম না। সবাই পারে না। তুমি উঠে এলে কেন?’

‘ঘুম ভেঙে গেল। কটা বাজে, এবার যেতে হবে।’

‘যাবে মানে? এখন কত রাত তুমি জানো? বিদে পেয়েছে?’

‘অ পেয়েছে। কিন্তু আমার কি থাকা উচিত হবে?’

‘আর কতকাল উচিত অনুচিতের টানাপোড়েনে থাকবে। তুমি টিভিটা খুলে বোসো, আমি ডিনার রেডি করি।’ কাছে গিয়ে দীপ্তর ঠোঁটে আলতো চুমু খেল মোহর।

এক ঘণ্টার জন্যে এসেছিল কিন্তু দেখতে দেখতে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে মোহর তাকে দুহাতে আগলে রেখেছে। দ্বিতীয় দিনে তার শরীরের অবস্থা দেখে তাকে শারীরিক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কিন্তু দীপ্ত ইতিবাচক উঠছিল। এই বন্ধ ফ্ল্যাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত সে বলল, ‘এবার যেতে দাও।’

‘আমার কাছে থাকতে আর ভাল লাগছে না?’

‘তা নয়। কিন্তু কেন থাকবে?’

‘আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?’

‘শুধু ভাল লাগার জন্যে এভাবে থাকা যায় না। ভেতরের জীবনের পাশাপাশি একটা বাইরের জীবন যে বড় প্রয়োজন।’

‘তোমার বাইরের জীবন মানে এইসব কবিদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যাদের কোনও বেস নেই। যারা তোমাকে কিছুই দিতে পারবে না। ব্যর্থতা ছাড়া ওদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমার বাইরের জীবনের সঙ্গে এদের কোনও সংযোগ নেই। আমি কোনও পাটিতে গেলেও তার পেছনে কারণ থাকে।’

‘খুবই স্বাভাবিক।’

‘তাহলে?’

‘আমাকে যেতে দাও।’

‘তোমার খুব অহঙ্কার, না? নিজেকে খুব বড় কবি মনে করো?’

‘কবিরের তো অহঙ্কার থাকেই।’ দীপ্ত হাসল।

‘ওয়েল। তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তুমি আসতে পার দীপ্ত।’

দীপ্ত চলে গেল। হঠাৎ নিজের ওপর অচণ্ড রাগ হল মোহরের। এই দুদিন ধরে এসব কেন করতে গেল সে? এই অপমানকে ডেকে আনার কি দরকার ছিল? এই দুদিন তার সঙ্গে একজন ক্রীতদাসীর কোনও তফাত ছিল না। যে সমস্ত নারী সারা জীবন স্বামীর সন্তোষের জন্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেন তাদের সঙ্গে তার কি পার্থক্য ছিল? অর্থাৎ সে যতই লিখুক বা বলুক তার ভেতরে ভেতরে একটা মন নির্লজ্জের মত রয়ে গেছে যে বলতে পারে আমি তোমাকে চাই যতক্ষণ তুমি আমাকে চাইছ। অর্থাৎ আমার চাওয়া শেষ হয়ে গেলেও আমি লেগে থাকব কারণ তুমি আমাকে চাইছ।

সারাটা দিন ছাঁকটিয়ে কাটাল মোহর। নিজের ওপর থোমা প্রবল হচ্ছিল। ক্রমশ সে নিজেইকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল একা থাকলে সে ভয়ঙ্কর কাজটা করে ফেলবে। দীপ্তকে বলা দরকার এই দুটো দিনের স্মৃতি সে মুছে ফেলছে।

গাড়ি নেই এখন। প্রায় রাত দশটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে গেল সে দীপ্তদের বাড়িতে। দরজায় তালা দেওয়া। বাড়িতে কেউ নেই। পাশের বাড়ির এক জ্বরালোক শব্দ পেয়ে এগিয়ে এলেন, ‘ও, অসুখ। দীপ্ত খুব অসুস্থ। পিজিতে ভর্তি হয়েছে।’

ফ্যাকাশে হয়ে গেল মোহর ‘কি হয়েছে?’

‘ঠিক জানি না। লিভারের ব্যাপার বলে শুনছি।’

দোকা পিঙ্কিতে ঢাল এল মোহর ট্যাক্সিটা নিয়ে। দু’র থেকে দেখতে পেল মোহরের মা আর দিদি সিঁড়িতে বসে আছেন। খানিকটা দূরে দীপ্তর কবি বন্ধুরের দল। এরা সবাই রাত জাগছে। আচমকা মনে হল তার কিছু হলো, এভাবে হাসপাতালে ভর্তি হলে রাত জাগার জন্যে একজনও থাকবে না। কিরকম শির শির করতে লাগল।

‘দীপ্ত কি আপনার ওখানে ডিউ করেছে?’

‘না।’ মাথা ন্যডল মোহর।

‘কোনও অনিয়ম?’

উত্তর দিতে পারল না মোহর। অনিয়ম মানে কি? দীপ্ত তার বাড়িতে যে জীবন যাপন করে মোহরের কাছে আটচল্লিশ ঘণ্টা সেই জীবন যাপন করেনি। সেটা কি অনিয়ম। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে দীপ্তর।’

‘লিভারের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক। ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছেন।’
‘কি আশ্চর্য! এটা কেমন করে হল?’
‘জানি না। কিন্তু আপনার গুণান থেকে ফিরে আসার পর হয়েছে। তাই আপনাকে গুরু যা দিদি ঠিক সত্য করতে পারবে না।’
‘আমাকে চলে যেতে বলছেন?’
‘সেটাও সবার পক্ষে ভাল হবে।’
মোহরের ইচ্ছে হল নিষেধ না শুনতে। দীপ্তর মাকে গিয়ে বলতে, আপনার ছেলে আমার কাছে খুব যত্নে ছিল। কিন্তু মনে হল এ তো কৈফিয়ত দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কাকে কৈফিয়ত দেবে সে? কি জন্যে? ফিরে গেল মোহর।
কলকাতার বাস চুকল। যাওয়ার দিন অমরা মুখার্জি এলেন। মোহর এটা আশা করেন।
জিনিসপত্র যা ছিল সবই বিলিয়ে দিয়েছে মোহর। সাজানো ফ্ল্যাটে থাকার সুবিধে হল ব্যক্তিগত বইপত্র বা জামাকাপড় ছাড়া জিনিসের সংখ্যা বাড় না। দুপুরে অফিসে গিয়ে রবিনের সঙ্গে দেখা করেছে মোহর। রবিন গম্ভীর ছিল। ভদ্রভাবেই বলল, ‘তুমি আরও সফল হও। কোর্টের কাগজপত্র পাওয়ায় আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব। ওখানে পৌঁছে টিকানাটা জানিয়ে।’
মোহর সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার কেমন লাগছে এখন?’
রবিন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। উত্তর দিল না, একটু হাসল। মোহরের মনে হল, হাসিটার মনে ভাল, খুব ভাল লাগছে।

মধ্য রাতের ফ্লাইট। অমরা মুখার্জি নিষেধ শুনলেন না। ট্যান্সি নিয়ে মেয়েকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে এলেন। মোহরের হঠাৎ মনে হল আজ সারাদিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনও কথাই হয়নি। ট্যান্সির পেছনের আসনে ওরা সামান্য ব্যবধান রেখে পাশাপাশি বসে আছে।
মোহর জিজ্ঞাসা করল, ‘এত রাতে তুমি কি করে ফিরবে?’
‘ফিরে তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বিমানকন্ডরেই ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করব।’
‘বাবা!’
‘বলো!’
‘আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি বলে তুমি কিছু মনে করছে?’
‘আমি কি কখনও তোমার কোনও কাজে বাধা দিয়েছি?’
‘দিতে ইচ্ছে করেনি?’
‘হ্যাঁ। করেছে। কিন্তু মনে হয়েছে যদি আমার বাধা দেবার কারণে তোমার কোনও ক্ষতি হয় তাহলে তার দায় বহন করার সাধ্য আমার নেই। তোমার জীবন, ভাল করলে তুমিই করবে, ঠিক করলে তোমারই ভাল। যতদিন নিজের পায়ের না দাঁড়িয়েছে ততদিন আগলে রেখেছি। এখন তো তোমার ভালকন্ড বোধ তৈরি হয়ে গিয়েছে।’

এয়ারপোর্টের আন্তর্জাতিক লাউঞ্জে জিনিসপত্র জমা করে আবার বেরিয়ে এল মোহর। বিশাল হলঘরের কোণে একটা চেয়ারে হাতের ওপর চিবুক রেখে অমরা মুখার্জি বসে আছেন। মেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে বলে সমস্ত অপছন্দ সত্ত্বেও এই যে এখানে এসে বসে আছেন তার যে ব্যাখ্যা সেটা যে কোনও সত্যানের সারা জীবনের সন্ধ্যা। মুখ নিচু করে বসে থাকা সৌচকে কি রকম অসহ্য দেখাচ্ছিল। কাছে চলে এল মোহর। মুখ তুললেন অমরা মুখার্জি, ‘সব হয়ে গেল?’
‘হ্যাঁ।’

অমরা মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন। আচমকা একটা আবেগ এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে মোহর জ্ঞান হবার পর এই প্রথমবার বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হল। কান্না জড়ানো গলায় সে বলতে লাগল, ‘বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি।’

মেহের মাথায় হাত বেলাতে বেলাত অমরা মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ভালবাসা মানে মুন্সি?’
আচমকা মেহের কান্না থেমে গেল। বাবার বুক থেকে মুখ তুলে বলল, ‘এতদিন বুঝতাম না।’
‘তাহলে আর কোনও ভয় নেই মা। তোর যখনই মনে হবে তুই চলে আসিস।’
‘বাবা, জানো, দীপ্ত এখন হাসপাতালে। ওর অবস্থা খুব খারাপ।’
‘জানি। তুই যখন দুপুরে বেরিয়েছিলি তখন টেলিফোন এসেছিল।’
‘কে করেছিল?’
‘নাম বলল সৌমিত্র।’
‘সৌমিত্র? কি বলল?’
‘ওই কথাই বলল।’
‘কিন্তু দীপ্ত নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। যাবে না বাবা?’
‘নিশ্চয়ই যাবে। তোর ফ্লাইটের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে।’
‘বাবা!’
‘আয় মা। গিয়েই চিঠি দিস।’
মোহর অন্ধের মত হাঁটতে লাগল।

তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে প্লেনের সিটে শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল মোহর। হলদুপুর থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি-বোম্বের দ্বাণ নিয়ে লন্ডনে। না, আর ফিরে তাকানোর কোনও মানে হয় না। তাকে নতুন বিষয় ভাবতে হবে। মানুষের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সম্প্রসারণলোকে আঘাত দেবার জন্যে অনেক অনেক লেখা লিখতে হবে। আর এর প্রতিটি লেখার চমক, প্রতিটি লেখার পেছনে তার দুঃসাহসের পরিচয় পেয়ে পৃথিবীর অনেক মানুষ স্তম্ভিত থাকবে। আর তার জন্যেই বেঁচে থাক। এই প্লেন লন্ডনে পৌঁছাবার আগেই দীপ্ত যদি পৃথিবী থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় তাহলে সে কি করতে পারে। বরং কখনও তো সে দীপ্তকেই তার লেখার বিষয়বস্তু করতে পারে। বিবাহিত জীবনে দীপ্ত কখনও তাকে বন্ধুত্ব দেয়নি।

মোহর সোজা হয়ে বসল। জানলার বাইরে তাকাল। এতক্ষণে ভোর হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ আকাশে অন্ধকার। পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে প্লেন। রাতটা রাতই থেকে যাচ্ছে সেই কারণে। জন্মবার সময় যে মেয়ে কীদেদি, এখন এই এত অন্ধকার দেখে তার চোখে কান্না আসবে কেন?